এখন ডুয়ার্স

১ জানয়ারি ২০১৭। ১২ টাকা

ক্যাশলেস ডুয়ার্সে পর্যটকের স্রোত

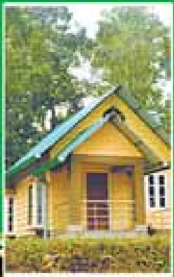

চা-বাগানে নোট বাতিলের ধাক্কা সামলে দিল প্রশাসনিক তৎপরতা

২০১৭ কেমন হে যাবে?

শুরু হল চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'

দলগাঁওয়ের দুই হোম স্টে

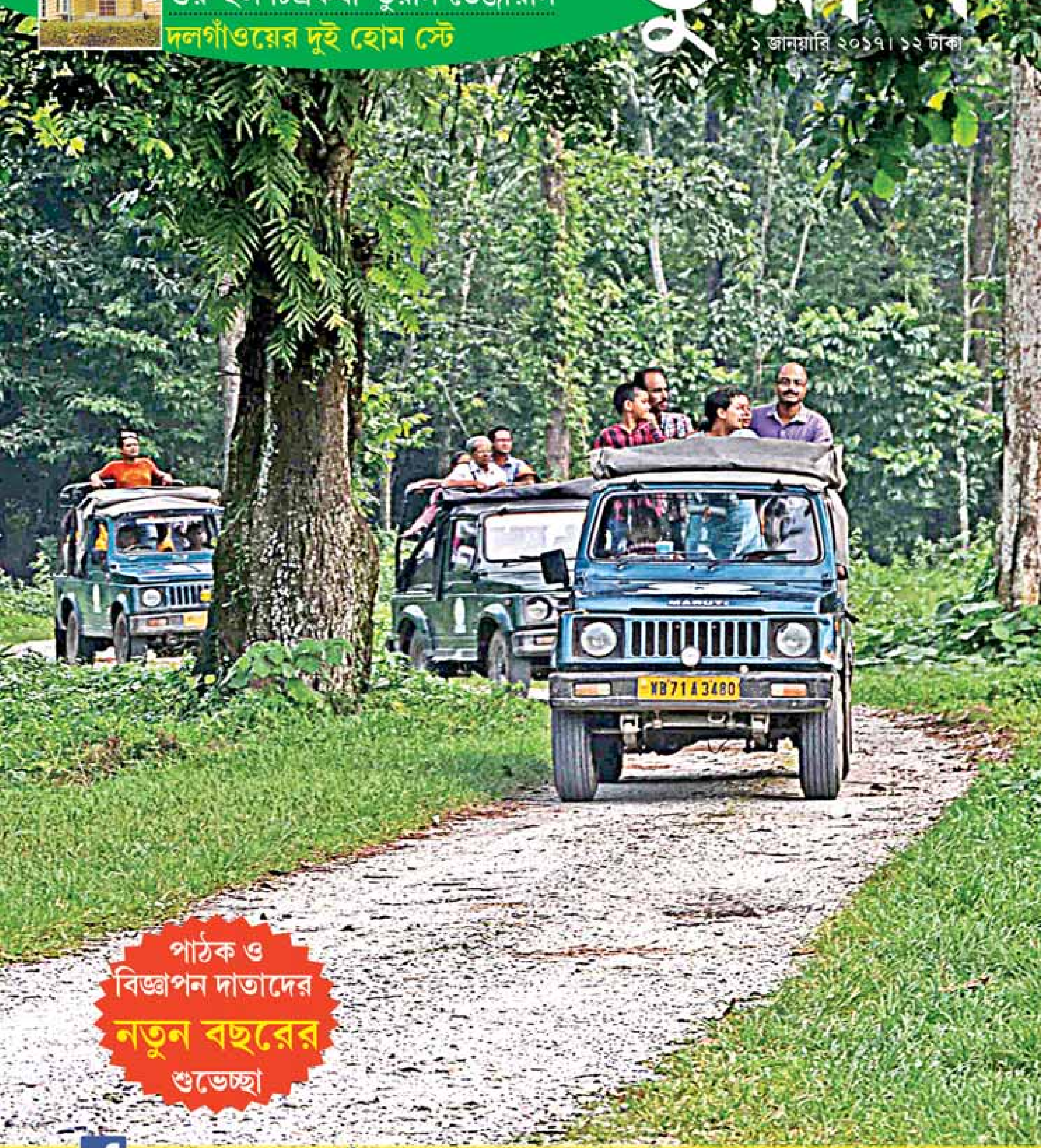

পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতাদের **নতুন বছরের** শুভেচ্ছা

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

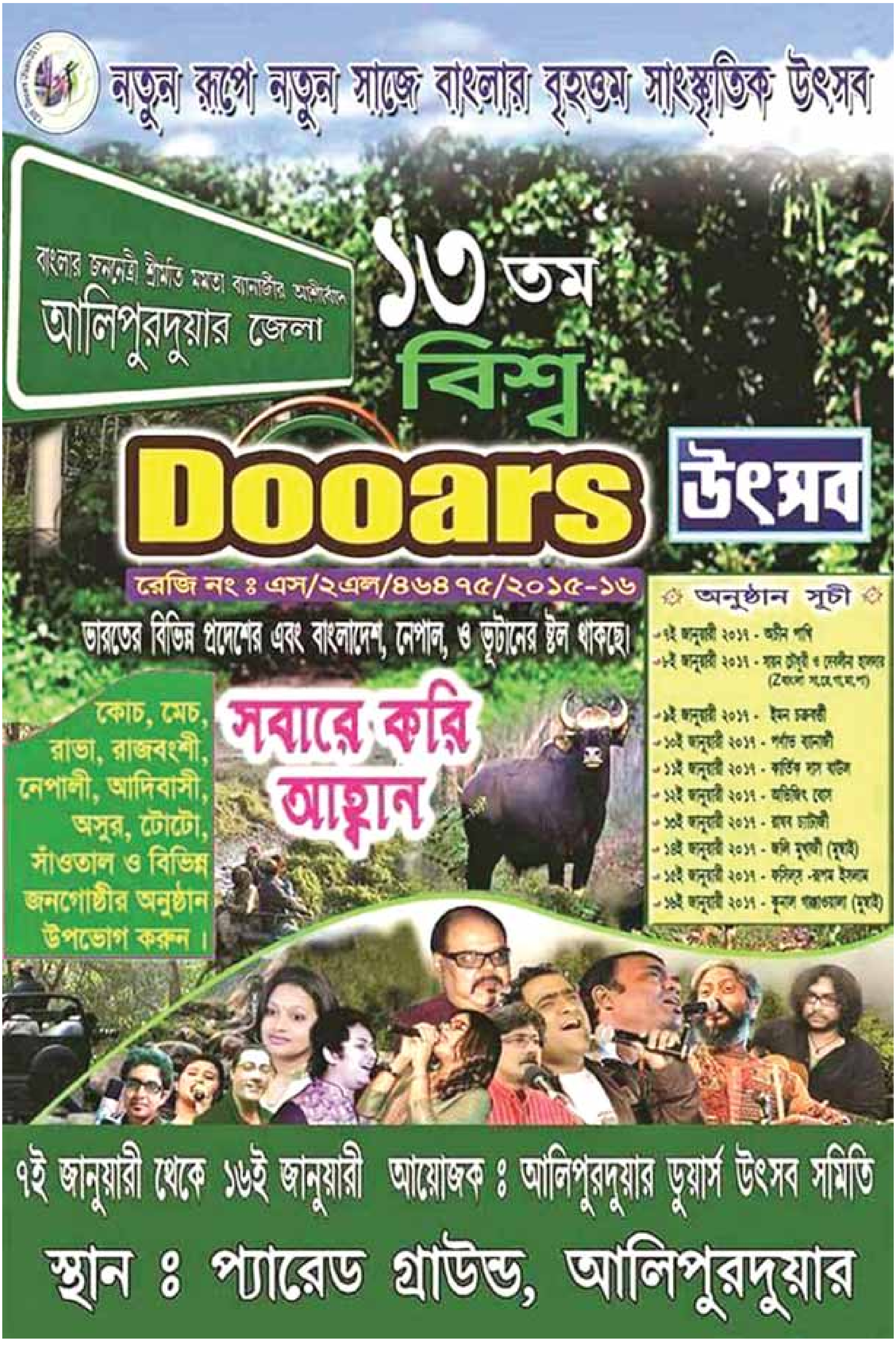
নতুন রূপে নতুন সাজে বাংলার বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসব
বাংলার জননেত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জীর আশীর্বাদে
আলিপুরদুয়ার জেলা
১৩তম
বিশ্ব
Dooars
উৎসব
রেজি নং ঃ এস/২এল/৪৬৪৭৫/২০১৫-১৬
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং বাংলাদেশ, নেপাল, ও ভূটানের ষ্টল থাকছে।
অনুষ্ঠান সূচী
কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালী, আদিবাসী, অসুর, টোটো, সাঁওতাল ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান উপভোগ করুন ।
সবারে করি আহ্বান
৭ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী
আয়োজক ঃ আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স উৎসব সমিতি
স্থান ঃ প্যারেড গ্রাউন্ড, আলিপুরদুয়ার

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি শহর সংলগ্ন স্থানে করলা নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে তুলেছে অপূর্ব সুন্দর স্পোর্টস ভিলেজ। মাঝখানে বিরাট খেলার মাঠকে ঘিরে স্টেডিয়াম। পাহারপুর দিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে ঢোকার মুখে এমন একটি স্পোর্টস ভিলেজ নিঃসন্দেহে বাইরে থেকে আসা খেলোয়াড়দের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক একটি অবস্থান। সেই সঙ্গে পাশ দিয়ে বয়ে চলা করলা নদী এই সৌন্দর্য্যকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন খেলার আয়োজন শুরুও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাবনা অনেক বড়। শহরবাসীর শুভেচ্ছায় এটি নিশ্চয়ই আগামী দিনে একটি বিশেষ স্থানের মর্যাদা পাবে।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
১ জানুয়ারি ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
‘ডুয়ার্স উৎসব’ কেন কলকাতা-দিল্লির মেলা প্রাঙ্গণে নয়? ৪

ক্যাশলেস ডুয়ার্সে শীতের পর্যটক স্রোত অটুট ৭

কেমন হে যাবে ২০১৭? ৯

ডুয়ার্সের ডায়েরি
চালশেয় ধরা পড়ে ডুয়ার্সের বদলে যাওয়া জলছবি ১২

দূরবিন
‘স্টেরয়েড’ নগরায়ণে অবরুদ্ধ উত্তরের গেটওয়ে : নতুন বছরে কোনও আলো? ১৬

চা বাগানে নোট বাতিলের ধাক্কা সামলে দিল প্রশাসনিক তৎপরতা ১৮

পর্যটনের ডুয়ার্স
দলগাঁওয়ের দুই, মিচিলিংমা তামুধে ২২

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ২৬

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স
পাসিং শো-এ ফুঁ, তিস্তাপাড়ে টুঁ ৩৪

শিলিগুড়ির ন্যাফ-এর ‘নেচার স্টাডি ক্যাম্প ফর চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন, ২০১৬’ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৫
বইপত্রের ডুয়ার্স ৩৮
ভাবনা বাগান ৩৯
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪০

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৪
তরাই উৎরাই ২৮
লাল চন্দন নীল ছবি ৩০

শ্রীমতী ডুয়ার্স
শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের দ্বিতীয় আড্ডা জমজমাট ৪১
এবারের শ্রীমতী ৪২
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৩

সম্পাদকের ডুয়ার্স

‘ডুয়ার্স উৎসব’ কেন কলকাতা-দিল্লির মেলা প্রাঙ্গণে নয়?

আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স উৎসব নামকরণে ‘বিশ্ব’ শব্দের সংযোজন এবং বছরকয়েক হল, উৎসবের কলেবরে পরিবর্তন ডুয়ার্সের মানুষের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক বইকি। এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে থাকা ডুয়ার্সের পূর্ব অংশে এহেন ঝাঁ-চকচকে শহরের উৎসবের আয়োজন স্থানীয় এলাকার বাসিন্দাদের যেমন উজ্জীবিত করে, তেমনই ডুয়ার্স বেড়াতে আসা পর্যটককেও উৎসাহিত করে বইকি। অতএব এই বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের সাফল্য নিয়ে যে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তার বড় প্রমাণ— এবারই প্রথম ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে এই উৎসবে যোগদান। ডুয়ার্সের পর্যটনে ‘বিমুদ্রাকরণ’ বা ‘নোট বাতিল’ তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, এবারের কোচবিহার রাসমেলা বা শিলিগুড়ির খাইমেলা কিংবা জলপাইগুড়ির বইমেলা তার টাটকা প্রমাণ। অতএব ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজকদেরও যে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, সে কথা এখনই জোর দিয়ে বলে দেওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই ধরনের উৎসবে ডুয়ার্সের সংস্কৃতি বা মানুষের কথা কতটা পৌঁছায় বাইরের মানুষের কাছে? মোবাইল ফোনে সোশ্যাল মিডিয়ার দাপট মানুষকে যখন একে অপরের থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমাগত, সে সময় হয়ত এই ধরনের মিলন উৎসব দূরে সরে যাওয়া মানুষগুলিকে আবার কাছে টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু প্রত্যন্ত এই বঙ্গভূমির পিছিয়ে থাকার গল্প তো আর পৌঁছায় না বাইরের দুনিয়ার কাছে। হাতি-গন্ডার-বাইসনের বাইরে জঙ্গল ও চা-বাগানের মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনি বাকি দুনিয়ার কানে আদৌ কতটা পৌঁছাবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। নিন্দুকরা বলে থাকেন, ডুয়ার্স উৎসবের খবর রাখে না ডুয়ার্সের অন্য প্রান্তের লোকজন, বাইরের লোক তো দূরের কথা। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই উৎসব নিয়ে যে পুরো ডুয়ার্স জুড়ে হইচই চলবে পক্ষকাল ধরে, সেরকম চিত্র এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। পর্যটনের আঙিনায় ‘ডুয়ার্স’ নামের সার্থকতা মিলেছে। কিন্তু এতে এলাকার উপর সার্বিক দৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য এখনও সফল হয়নি। স্বভাবতই ডুয়ার্সের আসল ছবি তুলে ধরার জন্য ডুয়ার্স উৎসবের মাধ্যমেই আমাদের পৌঁছাতে হবে দুনিয়ার কাছে। অতএব আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে যে উৎসব হয়, তারই অনুরূপ উৎসবে আয়োজন হোক কলকাতা ও দিল্লির জনপ্রিয় মেলা প্রাঙ্গণে। যেখানে কেবল ডুয়ার্সের পর্যটনসম্ভারই নয়, ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতি, সংগীত, হস্তশিল্প, ঐতিহ্য, কৃষি-বাণিজ্য, নাটক-বইপত্র, অভাব-দুঃখ— সব কিছু হাজির করা হবে একই ছাতার নিচে। পিছিয়ে পড়া বাংলার এই ভূখণ্ড তবেই শাপমুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, নচেৎ নয়। এই মুহূর্তে বাংলার সরকারে প্রতিনিধিত্ব করছেন ডুয়ার্স-তরাইয়ের বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কাছে অনুরোধ, ডুয়ার্সকে এভাবে বাইরের দরবারে নিয়ে যেতে না পারলে চোরাচালান-বিচ্ছিন্নতা-উগ্রপন্থার অন্ধকারেই চিরকাল ডুবে থাকবে পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা এই মায়াবী ভূখণ্ড।

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

কালে কাউ

কালে কাউ, মানে ব্ল্যাক গোরু হল সেই গোরু, যাদের কথা ডুয়ার্সের পুরসভাগুলি জানে না। শহরের রাজপথে অকস্মাৎ সেসব গোরুকে পদচারণা করতে দেখা যায়। রাস্তায় বসে জ্যামজটও লাগিয়ে দেয়। এইসব আনঅ্যাকাউন্টেড গোরুর সুইস ব্যাঙ্ক হল নদীর চর। চুপিচুপি নদীতীরে খাটাল বানিয়ে সেখানে গোরু জমিয়ে রাখাটা ইদানীং প্রায় নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন কতিপয় দুগ্ধ ব্যবসায়ী। এর ফলে নদীর যে বারোটা বেজেই চলেছে, সে কি আর বলে দিতে হয় রে বাপ? তা সে দিন শিলিগুড়ির মহানন্দার খাটাল থেকে কালে কাউদের উচ্ছেদ নিয়ে যে ধুন্ধুমার ঘটে গেল, তাতে তো চোখ ছানার জিলিপি! উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়ামাত্র সে কী তেজ গোরক্ষকবাহিনীর! পুরকর্মীদের 'গদাম-ধাঁই' তো দিলই, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের টাকা নিয়েও চম্পট! কিন্তু পুরকর্মীরাও হাল ছাড়েননি। শেষে মহানন্দার খাটাল উচ্ছেদ করে মহানন্দে ফিরে গিয়েছেন তাঁরা। তা বাপু মহানন্দা তো হল, এবার ডুয়ার্সের আরও আরও নদীকে খাটালিকরণের হাত থেকে রক্ষা করো দিকি!

ওরে বাবা

এমনিতেই সোনালি চা-বাগান নিয়ে ঘটনার শেষ নেই। দিনান্তে সে বাগানের শ্রমিক ঘরে ফিরে পরিবার নিয়ে একটু খাওয়াদাওয়া করবেন— সেখানেও ঘটনা। আর সে যে কী ঘটনা রে ভাই! ভাবতেই জুলফির রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে! সবে থালা-বাসন পেতে মাংসের কড়াইটা টেনে নিয়েছে গেরস্ত,

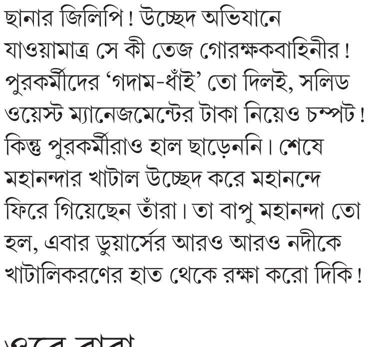

অমনি কী জানি একটা এসে পড়ল উঠোনে। তারপরেই এক ভয়ানক 'দুম'! ধোঁয়া, আগুন, গোলমাল। খাদ্য ফেলে দে চম্পট পরিবারের লোকজন। উঠোনে দেখা গেল তিন ফুট গভীর গর্ত হয়ে গিয়েছে। উত্তেজনা কিঞ্চিৎ কমতে বোঝা গেল জঙ্গি নয়, পাশের ঘিস নদীতে কামান ছোড়া অভ্যেস করছিল সেনাবাহিনী। তারই এক টুকরো উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল সুনীল ওঁরাওয়ের বাড়ির উঠোনে। বোঝো ঠেলা! গুলতি ছোড়া অভ্যেস করতে গিয়ে ভুলচুক হলে না হয় মানতুম। কিন্তু এ যে কামান দাদা! জওয়ানরা তো মাঝেমধ্যেই গোলাগুলি ছোড়া প্র্যাকটিস করে। তাদের টিপ এমনধারা নাকি? ওরে বাবা!

এবার বরাহ

আচ্ছা! মালবাজারবাসীদের প্রতি কি লাগোয়া জঙ্গলের বুনো নাগরিকরা জঙ্গি হামলার পণ করেছে নাকি হে? এদ্দিন হাতিদের জঙ্গি সংগঠন 'আল হাতিরা' সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। চিতারা তো ছিলই, বানরদেরও ভূমিকা লক্ষ করা যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। 'মুজাহিদ ই বাইসনি'র হামলার কথাও স্বীকার করেছে বন বিভাগ। এবার নতুন উত্থান 'লশকর ই বরাহি'র দুর্ধর্ষ জঙ্গি এক বুনো বরাহের। মংপঙের কাছে সুন্দরী বস্তির দুই বাসিন্দাকে সে দিন অতর্কিতে আক্রমণ করে প্রায় পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল এই নয়া জঙ্গি হামলা। প্রাণে বেঁচে যাওয়া দু'জন এখন হাসপাতালে। হাতি, বানর, চিতা, বাইসনের পর এবার শুয়োর। খুব জলদি বুনোদের পক্ষ থেকে স্বাধীন মালবাজারের দাবি উঠল বলে!

বিড়িম্বনা

কথায় বলে, 'বিড়িই উন্নতির সিঁড়ি'। তা রায়গঞ্জের করণদিঘিতে সে কথা সত্য বটে। কারণ সেখানে একমাত্র শিল্প হল বিড়িশিল্প। কান পাতলেই সেখানে 'বিরিয়ানি'র বদলে 'বিড়ি আনি' রব শোনা যায়। কিন্তু সেখানে বিড়ির এখন ভারী বিড়ম্বনা। যাকে বলে 'বিড়িম্বনা' আর কী! বিড়িবন্ধনের ফিজ সেখানে হাজারে সওয়াশো টাকা। আর সে টাকা দিতে হয় নগদেই। তারপর বিড়িকে প্যাকেটে ভরা, লেবেল লাগানো— এসব কাজের মজুরিও তো ওই নগদেই। অতএব বন্ধ। মালিকরা মাথা চুলকে বলছেন, ক্যাশলেস বিড়ি বাণিজ্য খুব গোলমেলে ব্যাপার। চেকে মজুরি নেওয়ার প্রস্তাবে বিড়িবন্ধনকারীরা মুখ বাঁকিয়ে বলছেন, আ ম'ল যা! দিনের শেষে চেক ভাঙিয়ে বাজার করে বাড়ি যাব কীভাবে? অতএব বিড়িম্বনা গোয়িং অন!

অওসামান্য

আগামী কুড়িতে ইলেকশন। সব মিলিয়ে ডজনখানেক। এর মধ্যেই ১৪৪ ধারা জারি। সাদা পোশাকের পুলিশ ভোটকেন্দ্রের চারপাশে ঘুরঘুর। বাপ রে! এর মধ্যে আবার কোথায় ভোটযুদ্ধ হচ্ছে কাকা? সীমান্তের কোনও এলাকায় উপনির্বাচনের খবর তো শুনিনিকো! আরে না রে দাদা! এ হল জলপাইগুড়ি জেলার ডজনখানেক কলেজে

ওটা প্রিন্সিপাল রে, ভোট ঘোষিত হয়েছে তো

ভোট হবে, তার প্রস্তুতি। তা কলেজ ভোট বলে কথা। বড়দের অনুকরণ করতে গিয়ে ছানারা আজকাল বাড়াবাড়ি করে ফেলছে কিনা। 'পাওয়ার' দেখানোর জন্য কলেজ নেতারা তাই ভোটের আশায় হাপিত্যেশ করছে যে! ক-ত্ত দিন পর ভোট। সংসদ দখলের জন্য হকি স্টিক, লাঠি, ধারালো চাকু, ফলস স্টুডেন্ট, মায় দেশি পিস্তলসুদ্ধ রেডি, অথচ ভোটই হচ্ছিল না গো! কী যে খেল দেখাবে গুরু! তা প্রশাসনও জানে। তাই রেডি। বাপ রে! এই না হলে কলেজ ইলেকশন! সত্যি অওসাম, মানে 'অওসামান্য'!

পথেই বসালি

শীতকালে শীত না পড়লে যা হয়। মাথা পেগলে যায় অনেকেরই। এই যেমন ইটাহারের এক স্কুল কর্তৃপক্ষর মাথা পেগলেছিল সে দিন! মিডডে মিল স্কুল ক্যাম্পাসে বসে খেলে ক্যাম্পাস নোংরা হবে, তাই তাঁরা বাচ্চাদের আদেশ দিয়েছেন, খানা খেতে হবে স্কুলের বাইরে। ফলে যা হল তা বলতেও লজ্জা লাগছে রে বাপ! বাচ্চাগুলো রাস্তায় বসে খেতে বাধ্য হল! তা স্কুলে একজন হেডু আছেন না? তিনি কি

পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে টাকা খাইয়ে হেডু হয়েছেন? নাকি শীত কম পড়ায় অকালে শীতঘুম ভেঙে গিয়েছে তাঁর? আহা রে! কে আছিস? স্কুল কর্তৃপক্ষর জন্য চুনকালির ব্যবস্থা কর! যত্তসব অসম্ভব অসভ্যের দল! বাচ্চাগুলোকে পথেই বসালি?

টানলেই টান

দিনকাল ভাল নয় কত্তা! ভাবছেন শীতের দুপুরে হাটে ফুলকপির দাম নিয়ে দরাদরি করতে করতে একটু বিড়ি টানবেন, কিংবা লাল চা খেয়ে একটু ধোঁয়া উড়িয়ে কোনও হাটুরের সঙ্গে দুটো কথা বলবেন? খবরদার না! ওরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু। বিড়ি টেনেছেন কী খপ করে হাতে ধরিয়ে দেবে দু'শো টাকার রসিদ। সোজা কথায়, ডুয়ার্সের হাটেবাজারে ধোঁয়া টেনেছেন কি ফেঁসেছেন! টানলেই টান পড়বে পকেটে। আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের মধ্যেই লোকজন জমায়েত হয় এমন জায়গায় সুখটান বন্ধ করতে

উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে সরকার। এই তো সে দিনই নকশালবাড়ির হাটে ডজনখানেক হাটুরে ফাইন দিয়ে গজগজ করতে করতে বাড়ি ফিরেছেন বাজার না করে। ফাইন আদায় ক্যাশলেস হয়নি যে!

আবার বালিবধ

মাঝে আদালতের হুকুমে বন্ধ ছিল, কিন্তু সে সমস্যা মেটার পর আবার শুরু হয়েছে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে মহানন্দে ডুয়ার্সের নদীগুলো থেকে বালি তোলার ধুম! যাঁরা সরকারকে রীতিমতো টাকা দিয়ে বালি তোলার অধিকার পেয়েছেন, তাঁদের চোখেই ধরা পড়েছে এই ফাঁকিবাজি। দলে দলে ট্রাক আসছে আর বালি তুলে কেটে পড়ছে। অনুমতি বলে যে একখানা ব্যাপার আছে, সেটা তাঁদের হাবভাব দেখে মনেই হচ্ছে না। কর্মচারীদেরও বিশেষ হেলদোল নেই। উলটে নাকি অনুমতিধারীদের গ্রেপ্তার করায় দুর্দান্ত আগ্রহ দেখাচ্ছে। ভারী মজার ব্যাপার তো! ট্রাইব্যুনাল 'হ্যাঁ' বলেছে কী রে রে করে নেমে পড়েছে বালিবধে! তা একটু লজ্জা-টজ্জা না পেলে চলবে কী করে বাবু! ট্রাইব্যুনাল যদি এর পর আবার 'না' বলে দেয়, তখন তো পথে বসবি রে!

কিপটে পর্ষদ

তা ছাড়া আবার কী! টাকা পেয়েও খচ্চা না করে জমিয়ে রাখবে আর সংসারে হাহাকার তোলাবে তো কিপটে বলব না কেন হে? গুনে গুনে যে পাঁচশো কোটি টাকা দেওয়া হল সংসারের কাজকর্মের জন্য, তার দশ ভাগও খরচা করলি নাকো! বলি রবি! কী এমন রাজকায্যি ছিল তোর যে মাত্তর পঞ্চাশ কোটির বেশি খচ্চাই করতে পারলিনে? ঠিক আছে! নেক্সট আর্থিক ইয়ারে আবার টাকা চেয়ে দেখ। দু'টাকার বেশি এক পয়সাও পাবিনেকো! লোকে বলে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদে আমি নাকি টাকাই দিই না! আর দিলে যে তোরা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখবি, সেটা তো কেউ দেখছে না! থাকত গৌতম, দেখতিস খচ্চা কাকে বলে! তুই কিন্তু কিপটে হয়ে যাচ্ছিস রে রবি! এবার শুধরে নে! তিন মাসে সাড়ে চারশোর গতি কর! টয় ট্রেন লিজ নিয়ে চালা!

স্টেপ নিয়েই নিন

সেই কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে মাছ আসে জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে থার্মোকলের বাক্সে বোঝাই হয়ে গেরস্তের পাতে ঝোল হবে বলে! তা মাছ তো গেল পেটে, বাক্স যাবে কোথায়? বহু দিনের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা সেসব করলা নদীর পাড়েই ফেলে দেয়। এই নিয়ে করলা বাঁচাও কমিটির সঙ্গে গোলমালও বেধেছিল একদা। পরিস্থিতি অনুকূলে নেই দেখে ব্যবসায়ীরা প্রমিস করেছিলেন, আর ফেলবেন না বাক্স এবং পচা মৎস্য। কিন্তু কথা আর কবে কে রেখেছে এই কলিযুগে? ফলে আবার বাক্স জমে পাহাড়-নদীর ধারে। পরলোকগত নষ্ট মৎস্যের গন্ধে নদীর পাশে যাওয়া দায়। জলে বিচ্ছিরি দূষণ। পরিবেশপ্রেমীরা রেগে আটটা। শোনা গেল, পুরপতি নাকি বলেছেন, নো বরদাস্ত! কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তা আমরা বলি, স্যার, স্টেপটা নিয়েই নিন। রাস্তার ফুটপাথও তো দখল হয়ে আছে। অত খচ্চা করে সুন্দর করে বানালেন! সেখানেও নিয়ে নিন আরেকটা স্টেপ।

ঠ্যাঙের যত্ন নিন

এই শীতে ঠ্যাঙের যত্ন কীভাবে নিতে হবে, সে নিয়ে ভূরি ভূরি উপদেশ ছাপা হচ্ছে। সেইসব উপদেশ পালন করে আপনার পদোন্নতিও ঘটছে নিশ্চয়ই। কিন্তু মামা!

আপনার তো মোটে দু'খানা ঠ্যাঙ। যাদের চারটে, তাদের কী হবে? চারপেয়েদের বুঝি শীতে পদযত্ন নিতে হয় না? শীতে তাদের পায়ে বুঝি ভাইরাস আক্রমণ করে না? গোরুমারার এলাকার এক বাইসনবাবু তো সেই আক্রমণেই ইহলোক ত্যাগ করলেন সে দিন! কিন্তু গোলমালের ব্যাপার হল যে, চারপেয়েরা আবার আমাদের শীতকালীন পদচর্যা বিষয়ক পরামর্শগুলো বুঝতে পারছে না। তা ছাড়া আপনার ওই ছ'শো টাকার তেল আপনার কোমল পায়ের পক্ষে দুর্দান্ত মানছি, কিন্তু বাইসন-হাতির পায়ে সেসব নস্যি। ফলে বন দপ্তর এখন বুনোদের চার পায়ে লোশন লাগাতে ব্যস্ত। আগে দপ্তরের হাতিদের টিকে লাগাচ্ছে। তারপর দরকার পড়লে অন্যান্যদের। কিন্তু সমস্যা একটাই। কেউই সোনামুখ করে টিকে নিতে রাজি নয়কো! আক্ষরিক অর্থেই 'ধরে-বেঁধে' দিতে হচ্ছে।

টুকরাণু

আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে রয়্যাল বেঙ্গল আসবে শিলিগুড়িতে। ডুয়ার্সে পৌষ মাস পড়লেও শীতের দেখা নাই। গোসানিমারিতে ইতিহাস চুরি চলছে, চলবে। চা-বাগান এলাকায় এটিএম বসানোর জোর উদ্যোগ, তবে তাতে টাকা থাকবে কি না বোঝা যাচ্ছে না! খয়েরবাড়িতে হবে দুর্দান্ত চিতা সাফারি। এনবিএসটিসি-র এক বাসের কনডাক্টরের কাছ থেকে টিকিট ছিনিয়ে চম্পট মহিলা যাত্রীর। ডুয়ার্সে হাতিরা আছে হাতিতেই, হামলা অব্যাহত। নগদের অভাবে শো নেই, তাই মজুরি খাটছে ডুয়ার্সের লোকগায়ক শিল্পীরা।

ক্যাশলেস ডুয়ার্স পরিক্রমা ২

ক্যাশলেস ডুয়ার্সে শীতের পর্যটক স্রোত অটুট

একেবারে টেনশন ছিল না— এ কথা বলব না। মনের কোণে খানিক অনিশ্চয়তা ছিলই। বছরের শেষ দিনে এসে তা একেবারে দূর হয়ে গেল বলতে পারেন। একবারের জন্য হলেও মনে হচ্ছে, নতুন বছরটা ভালই কাটবে। জর্দা পান খাওয়া কালো দাঁত বিকশিত করে হাসল শশাঙ্ক। খুব ভোরে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে ট্রেন, আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। হাঁ করলেই মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে অনর্গল। ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকে বোঁচকাসহ এই পুরনো চেনা গেস্টকে তুলে নিয়ে উল্কার গতিতে গাড়ি ছোটাচ্ছিল সুমোর ছোকরা ড্রাইভার। লাটাগুড়ির রিসর্টে নামিয়ে দিয়েই আবার ছুটবে। পাঁচ কিলোমিটার দূরে আরেক রিসর্টে যে অপেক্ষা করছে পাঁচজনের পরিবার, তাদের নিয়ে পৌঁছাতে হবে টিকিট কাউন্টারে! দিনের প্রথম সাফারিতে তাদের টিকিট বুক করতে সেখানে রাতভর লাইনে দাঁড়িয়েছে লাটাগুড়ির কোনও উঠতি বয়সি তরুণ, লাইনটা তাদের ধরিয়ে দিয়েই বাড়িতে ঘুমাতে যাবে সে।

ছবিটা সেই একই রকম আছে। যা ছিল গত বছর এই দিনটিতে। কিংবা তার আগের বছর বা আগের আগের বছর। কোথাও এতটুকু বদলায়নি। কাকভোরে সরগরম লাটাগুড়ি টিকিট কাউন্টার চত্বর। জিপসির লাইন, হাতের চেটোতে গরম চায়ের গ্লাস আর আঙুলে জ্বলন্ত তামাক। ৩১ ডিসেম্বরের সকালে ডুয়ার্স আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে সেই একইভাবে। নরেন্দ্রভাই মোদি তাতে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেননি। মাঙ্কি ক্যাপ-মাফলারে ঢাকা সব মুখ, চোখে হাসির ঝিলিক দেখে চিনে নিতে হয়। কিংবা ‘গুড মর্নিং দাদা, এই এলেন? কোথায় উঠলেন?’ গলার আওয়াজে বোঝা যায়, পরম আন্তরিকতার ডুয়ার্স সেই একই আছে— অকৃত্রিম, এই ক্যাশলেস কঠিন দিনগুলিতেও।

গত সংখ্যায় পড়েছিলাম ‘ক্যাশলেস ডুয়ার্স’ বেশ কষ্টে আছে। খুবই স্বাভাবিক। বহুদিন হল যুদ্ধের সাইরেন নেই, দাঙ্গার কার্ফিউ নেই, মহামারি নেই, শিক্ষা নেই, শিল্প নেই, রোজগার নেই— তবুও শান্তিতেই ছিলাম আমরা। কোনও এক ‘উচ্চাভিলাষী’ প্রধানমন্ত্রী এসে ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে আমাদের শান্তিতে থাকার ‘মৌলিক অধিকার’ হঠাৎ করে কেড়ে নেবেন, আমাদের কয়েক পুরুষ ধরে লালিত অভ্যাসকে ধরে প্রবল নাড়া দেবেন— এ মেনে নেওয়া যায় কখনও? স্বভাবতই আমরা উদ্‌বিগ্ন ছিলাম। বিশেষ করে এবার পর্যটনের মরশুমে ডুয়ার্স তথা উত্তরের পাহাড়ে নগদের অভাব কতটা প্রভাব ফেলবে, সেই শঙ্কায়। বারবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম বিভিন্ন স্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, প্রথম কিছুদিন ভ্রু সবারই কুঁচকে ছিল। কেবল ট্রেনের রিজার্ভেশনে ওয়েটিং লিস্টের বহর তাদের আশা জাগিয়ে রেখেছিল।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শঙ্কা দূর হতে শুরু করে। বহু পর্যটক ভিড় এড়াতে আজকাল আগেভাগেই চলে আসছে। গত পুজোর মরশুমেই তা লক্ষ করা গিয়েছে। বিশেষ করে যাঁদের বাড়িতে স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ে নেই কিংবা যাঁরা স্কুল-কলেজে পড়ান না, তাদের কর্মক্ষেত্রে ছুটি নেওয়াটা যে কোনও সময়েই এক। ফলত, পিক সিজনের বাইরেও পর্যটক আসছে। ডে ভিজিটর ছাড়াও স্থানীয় মানুষের মধ্যেও উইকএন্ডে এক-দু’রাত কাটাবার অভ্যেস শুরু হয়েছে। এরকমই ব্যাখ্যা লাটাগুড়ির হোটেল-রিসর্ট মালিকদের। অথচ ক্যাশের অভাবে অনেক ব্যবসাই তো মার খাচ্ছে। পর্যটন তা থেকে বাঁচল কী করে? উত্তর খুবই সহজ, বললেন তাঁদেরই একজন। বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান হয় বহু আগে থেকেই। নিজেদের শরীর খারাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে বাতিল হওয়ার চান্স নেই। হোটেলের পেমেন্ট গত কয়েক বছর ধরেই অনলাইন বা চেক মারফত জমা দেওয়ার অভ্যেস রপ্ত করেছে শহুরে পর্যটনপ্রেমী মধ্যবিত্ত। বেড়ানোর প্ল্যান আগে থেকেই হয়

বলে নগদ জোগাতে সমস্যা হচ্ছে না। নিজের চোখে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করতাম না, পাহাড়ে ডুয়ার্সে বছরের শেষ সপ্তাহে ভাড়ার গাড়ি মিলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। অথচ গাড়ি ভাড়া তো নগদেই মেটানো হয়! শিলিগুড়ির ভাড়া গাড়িচালক মোবারক এর যা ব্যাখ্যা করল, বেশির ভাগ গাড়িই এবার ট্র্যাভেল এজেন্ট বা রিসর্ট-হোটেলের প্যাকেজে ঢুকে গিয়েছে, পেমেন্ট তাদের তাৎক্ষণিক নগদে না পেলেও চলছে। অন্য দিকে, অতিথিরা গাড়ির ভাড়া 'পে' করছেন ট্র্যাভেল এজেন্ট বা হোটেলওয়ালাকে, ক্যাশ না থাকলে কার্ডে বা চেকে। অসুবিধা হচ্ছে না। আর যারা নিজেরা ভাড়া খাটছে বা পিক-আপ ড্রপ চালাচ্ছে, তাদেরও ক্যাশ পেতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। মোবারকের ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন এনজেপি'র ট্যাক্সি ড্রাইভার সুকুমার। তাঁর মতে, এবার টুরিস্ট যতটা সম্ভব ক্যাশ বাঁচিয়ে কার্ডে খরচ করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে দার্জিলিং-কালিম্পং-গ্যাংটক শহরে তাদের খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। ডুয়ার্স বা পাহাড়ে কোনওদিনই এটিএম সার্ভিস ভরসা করবার মতো ছিল না, জানালেন সদ্য সিক্করুট ফেরত বাঙালি পরিবার— এবার প্যাকেজে এসেছি, টাকা চেকে দিয়েছি। তা ছাড়াও যেটুকু নগদ রাখতে হয়, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বেড়াতে এসে শপিং এবার কম হল, কিন্তু পরের বছর এসে দেখব সবই অনলাইন হয়ে গিয়েছে। আর পাহাড়ি মানুষদের নতুন টেকনোলজির ব্যবহারে সবসময়ই এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। পাহাড় সফর সমাপ্ত করে যাওয়ার পথে গোরুমারা ছুঁয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় দেখা হল সেরকম আরও কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে। সবার বক্তব্য, এইসব রিসর্ট এলাকায় এটিএম আগেও বেশির ভাগ সময়ই অকেজো থাকত। লাটাগুড়িতে এসে এর আগেও বিপাকে পড়েছি, সেজন্য প্রস্তুতি নিয়েই আসতে হয়। তাই ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলেই এনেছি।

পর্যটকে থিকথিক করছে জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ। রেস্তরাঁ গমগম করছে, বাইরের চত্বরেও গাড়ি আর পর্যটকের ভিড়। ম্যানেজারের ব্যাখ্যা, বেড়াতে এলে সবাই টাকাপয়সা কমবেশি সঙ্গে নিয়েই আসে, আর খরচের বৃহদংশটাই অগ্রিম অনলাইন বা চেকে করে আসে। অন্যান্য অনেক জায়গাতেই যেমন কেনাকাটার জন্য প্রচুর ব্যয়ের সুযোগ থাকে, যেমন— পুরী, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি— ডুয়ার্সে তার পরিমাণ এখনও অনেক কম। অতএব নগদের অভাব অনুভূত হচ্ছে না তেমন।

নগদের অভাব অনুভব করা গেল না ঝাঝাঙ্গি বা নিমতির ধাবাতে। তরকা-রুটি, চিকেন তন্দুরি বা মাছ-ভাত উড়ছে দেদার। একদিকে এঁটো বাসন ধুতে ধুতে ক্লান্ত আদিবাসী বুড়োটি, অন্য দিকে ক্যাশ বাক্সে একই রকম নোট গুনতে ব্যস্ত হুমদো ম্যানেজার বা মালিকটি। কে বলবে, নগদের অভাবে মানুষের 'কষ্ট' সহ্য করতে না পেরে নিজেদের মধ্যে সব বিভেদ ভুলে 'স্বৈরাচারী' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঘন ঘন দিল্লি ছুটছেন তাবড় তাবড় নেতা? শুনে মুচকি হাসলেন এক ব্যাঙ্ক কর্মচারী। বললেন, আলিপুরদুয়ারের কাছে একটি মাঝারি গোছের ব্রাঞ্চ, তাঁদের একজন গ্রাহকের ভাটিখানা থেকে এক বেলার 'বিক্রি' নাকি যে কোনও সময়ই লাখের উপরে থাকে, এবং দশ থেকে একশোর নোটের ছড়াছড়ি। তাঁরই পালটা যুক্তি, আসলে হাওয়ায় চলে অনেক কিছুই, তেমনই এই নগদ অভাবের কেসটাও। জনমানসে বাস্তবের চাইতে বায়বীয় ধারণা তৈরি হয়েছে বেশি। টাকা তোলার ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি থাকায়, অভাবটা অনুভূত হয়েছে বেশি। কিন্তু আপনার দৈনন্দিন চলাফেরা, চাল-ডাল-মাছ-সবজি কেনায় টানাটানি পড়েছে কি? না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে থাকার মতো পরিস্থিতি হয়েছিল কারও? যেমন যুদ্ধ বা কার্ফিউতে হয়!

—যাব্বাবা এ তো দেখছি মোদির ভাষায় কথা কইছেন!

ব্যাঙ্ক কর্মী এবার রেগে গেলেন, দেখুন দাদা সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে আমাদের, সেটা তো মানবেন! কোনও ফ্যামিলি লাইফ নেই। তবু বলব, সব ক্ষমতা এখন আসছে ব্যাঙ্কের হাতেই, পঞ্চায়েতের নয়। ব্যবসায় এগোতে গেলে ব্যাঙ্কের ওপর ভরসা করতেই হবে, উপায় নেই। পর্যটন অনেক আগেই ব্যাঙ্কের হাত ধরেছে, তাই আজ আর চিন্তা নেই।

জয়ন্তী পৌঁছেও দেখলাম গাদাগাদি গাড়ি আর মানুষ। তাৎক্ষণিক বুকিং-এর আশায় এসেছে কয়েকটি পার্টি— চোখে-মুখে খুব একটা আশার আলো দেখলাম না। হাউজফুল। রিসর্টে রিসর্টে দুপুরের ভোজন শেষ না হতেই রাতের আয়োজন। দেখা হল কলকাতার এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। হপ্তা তিনেক আগে তাঁর চিন্তান্বিত মুখ দেখে এগিয়ে জানতে পেরেছিলাম ক্যাশ নয়, যাওয়ার টিকিট কনফার্ম হবে কি না শেষ পর্যন্ত, টেনশন তা নিয়েই। এখানেও বললেন, ক্যাশ 'ম্যানেজ' হয়ে গিয়েছে, কোনও চাপ নেই, ভাবছি তিনটি দিন বাড়িয়ে ভুটানটা সেরে যাব কি না, বারবার তো আসা হবে না!

পূর্ব ডুয়ার্স তথা আলিপুরদুয়ারকেন্দ্রিক পর্যটনে এবার হাসিমুখ দেখলাম সবারই। ইকো পর্যটন বা অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম চালায় কলকাতার নেচার ক্যাম্প ও হান্ড্রেড মাইলস। দু'জনেরই এক কথা, ঝাড় খেলেও খেতে পারতাম, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে দ্রুত, থ্যাঙ্ক গড। খরলো টুরস-এর দেবযানী বসু অবশ্য ঠোঁট উলটে বললেন, কী জানি বাবা, আমরা তো কিছুই টের পেলাম না। তাঁর মতে, গত কয়েক বছরে ফ্যামিলি বুকিং কিছুটা কমেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আপ মার্কেটে, যেখানে অনলাইন চালু হয়ে গিয়েছে বহু আগেই। কিন্তু নভেম্বরের নোট বাতিলের আঁচ সত্যিই বুঝতে পারিনি আমরা, বিশ্বাস করো।

বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ডুয়ার্সে এবার পর্যটনে বিক্রি অবিশ্বাস্য রকমের ভাল। আরও ভাল হবে বলে বিশ্বাস বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক পদস্থ বনকর্মীর। ফেরার ট্রেনে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লম্বা যাত্রার সঙ্গী। তাঁর মতে, নগদের অভাব মানুষকে আপাতত মিতব্যয়ী করবে, আবার কার্ডের ব্যবহার অদূর ভবিষ্যতে ব্যয়ের প্রগল্‌ভতাকে বাড়াবে। অর্থাৎ শুরুতে চাপ থাকলেও অদূর ভবিষ্যতেই ব্যয়ের আগল খুলে যাবে— এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। বছর পঁচিশ আগে মানুষের ব্যয় করার অভ্যেস বাড়াতে চালু হয়েছিল ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড। বাজার চাঙ্গা করতে সুদ কমিয়ে ব্যাঙ্ক তহবিল ফাকা হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী লোন। এবারের দাওয়াইতে মুমূর্ষু ব্যাঙ্ক যেমন চাঙ্গা হয়ে উঠল বেশ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ঘরে ঢোকায়, আবার বাজার অর্থনীতিও চালু রইল। অতএব শুধু পর্যটন কেন, দেখবেন মধ্যবিত্তের সখ-আহ্লাদ মেটানোর সব বাণিজ্যই আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে শীগগিরই।

অশোক উপাধ্যায়

নগদের অভাব অনুভব করা গেল না ঝাঝাঙ্গি বা নিমতির ধাবাতে। তরকা-রুটি, চিকেন তন্দুরি বা মাছ-ভাত উড়ছে দেদার। ক্যাশ বাক্সে নোট গুনতে ব্যস্ত হুমদো ম্যানেজার বা মালিকটি। কে বলবে, নগদের অভাবে মানুষের 'কষ্ট' সহ্য করতে না পেরে নিজেদের মধ্যে সব বিভেদ ভুলে 'স্বৈরাচারী' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঘন ঘন দিল্লি ছুটছেন তাবড় তাবড় নেতা?

কেমন হে যাবে ২০১৭?

সিন্ধু লিপিতে রচিত 'গ্রহবৈগুণ্য প্রবেশিকা সমুচ্চয়' অবলম্বনে মেষাদি দ্বাদশ রাশির ভাগ্য পরিহাসের ফল আমি ছাড়া আর কেহ গণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু গণনার ফলাফল গোপন রাখিতে মনস্থ করিলেও 'এখন ডুয়ার্স' কর্তৃপক্ষ রৌপ্যনির্মিত ছিলিম এবং ম্যানিলা ক্রিম উপঢৌকন দিবে জানিয়া তাহাদের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এই আশ্চর্য গণনা ছাপাইতে অনুমতি দেওয়া গেল। লগ্নবিশেষে রাশিফল কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইলেও হইতে পারে। —ইতি, কলম সিং

মেষ— প্রভাবশালী চেনা থাকলে গঠনমূলক কাজে দারুণ সাফল্য। কালো টাকা সাদা করার কাজ জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে শুরু করাই মঙ্গল। চাকরিজীবীদের এ বছর অনেক অ্যান্টাসিড খেতে হতে পারে। পড়শির উসকানিতে মদ্যপান করে ঝামেলায় জড়াতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা নিয়ে ভেবে লাভ নেই, বরং মিছিলে হেঁটে মন শান্ত করার চেষ্টা করলে ফল মিলবে। অগাস্ট থেকে সময় বদলাতে থাকবে। ওই সময় থেকে চায়ে চিনি খাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন। অবিবাহিতরা এ বছর প্রেম বা বিবাহ নিয়ে খামকা ভেবে সময় নষ্ট করবেন না। বিবাহিতরা পুরুষ হলে এপ্রিলের পর থেকে বউকে কিছু জিজ্ঞেস না করলে শান্তি পাবেন। পুজোর পর নতুন পেসমেকার ক্রয়ের যোগ। টিভি চ্যানেলে টক শো এড়িয়ে চলুন।

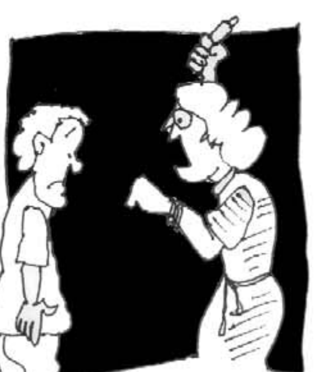

পড়শী ষড়যন্ত্রে পরকীয়া প্রকাশ

বৃষ— পরকীয়া নিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে যাচ্ছেতাই মনান্তর। কলেজের শিক্ষক হলে ছাত্রদলের হাতে অপদস্থ হয়ে মিডিয়ায় খবর হতে পারেন। এ বছর ফেসবুকে বহু মহিলার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এলেও, যাকে গ্রহণ করার, মার্চের আগেই করে ফেলুন। চিট ফান্ড ছাড়া অন্য কোনও নতুন ব্যবসার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। তবে এ বছর আপনার অর্থনৈতিক ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় একদিকে যেমন টাকা জমবে, অন্য দিকে পরকীয়া এবং হতাশাজনিত মদ্যপানে বেলাগাম খরচের ইঙ্গিত। তবে অগাস্ট থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, কেউ আসলে আপন নয়। অবিবাহিতদের একাধিক বিবাহের সম্ভাবনা। তাই এই বেলা উকিলের সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলুন। আত্মীয়স্বজনের ষড়যন্ত্র এড়াতে টোটোর ডান দিকে বসবেন না।

মিথুন— অতিরিক্ত ক্রোধ থেকে লক-আপে রাত কাটানোর সম্ভাবনা। বাধা-বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে লটারি পাওয়ার স্বপ্ন সফল হতে পারে। বস আপনার প্রতি সদয় না থাকলেও তাঁর বউয়ের কাছ থেকে আশাতীত হাতছানি পাবেন। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার বদলালে সর্বাধিক লাইক পাবেন, কিন্তু সেপ্টেম্বরে আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হতে পারে। এ বছর আপনার ভাগ্যে বিদেশ ভ্রমণের যোগ প্রবল, কিন্তু বিমানযাত্রার যোগ লক্ষ করা যায় না। ছদ্মবেশী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে রাস্তায় মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সম্ভাবনা প্রবল। তবে বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতরা অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাবেন, তাই বিবাহিতদের উচিত এ বছরটা সিঙ্গল থাকা। পারলে বউকে মার্চের মধ্যেই বাপের বাড়ি পাঠান।

কর্কট— উদ্যমের অভাবে ঘুসের টাকা বেহাত হয়ে যাবে। মন্ত্রীস্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল প্রতিশ্রুতি লাভ হলেও, তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে থাপ্পড় খাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অগ্নিকাণ্ডের কারণে অনেকগুলি নতুন দু'হাজার টাকার নোট পুড়ে যেতে পারে। সন্তানের কারণে গৃহে হাতাহাতি হতে পারে, তাই ফার্স্ট এইড বক্স হাতের কাছেই রাখবেন। বিপরীত লিঙ্গের পাশ দিয়ে চলাফেরার সময় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। বছরের মাঝামাঝি শত্রুর ক্যানসার হওয়ার খবরে আনন্দিত হবেন। যাঁরা নতুন গাড়ির কথা ভাবছেন, তাঁদের ক্ষমতাবান ব্যক্তির গাড়িতে ড্রাইভারের কাজ মেলা প্রায় নিশ্চিত। গৃহে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে আশানুরূপ গিফ্‌ট না-ও পেতে পারেন। সুতরাং শনি পুজোই বিধেয়।

তোলা আদায় যোগ শুরু সার

সিংহ— এ বছর ভাগ্য আপনার সহায়। প্রেম করার জন্য পরিবারের সকলের কাছ থেকে আশাতীত উৎসাহ পাবেন। উচ্চাভিলাষী মহিলার ফাঁদে পা দিয়ে বিদেশ পর্যন্ত ঘুরে আসবেন। ফেরার সময় পুলিশ এবং ইডি আপনার জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করবে। মিডিয়ায় মুখ দেখাবার বহু দিনের সুপ্ত আশা বারবার পূরণ হবে এ বছর। রাজনীতির

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

লোক হলে মাসের দ্বিতীয় পক্ষে কোনও স্ক্যাম না করাই ভাল। উপরওয়ালার কল্যাণে যে কোনও মামলায় জামিনলাভ নিশ্চিত।

নতুন ব্যবসার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল, কিন্তু অস্ত্র এবং নারী পাচারে বিনিয়োগ করতে পারেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়ফ্রেন্ড বাছাইয়ের সুযোগ। তবে গোপন ডেরা প্রস্তুত রাখুন। নভেম্বরের পর সেখানে আত্মগোপন আবশ্যিক হয়ে পড়বে। গোটা সিগারেট খাবেন না।

চিত্রফাঁসে অর্থক্ষতি

কন্যা— অপ্রিয় সত্য কথা বলার কারণে বউ বারবার চলে যাবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীরা ঘন ঘন লিকার শপে ছুটবেন, কিন্তু শেষ অবধি আপনার দাম্পত্যজীবন মোটামুটি

ভালই থাকবে বলে অনুমান। তোলা আদায়কারীদের কাছে এ বছর বিশেষ শুভ। নতুন হেলমেট, প্রেশারের ওযুধ এবং স্পন্ডেলাইটিসের কলার ক্রয়ের যোগ লক্ষণীয়। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে আত্মীয়কুটুমের বিশ্বাসঘাতকতায় গোপন প্রেম ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তবে ওই সময়ে বেশ কিছু কালো টাকা হাতে আসায় সব কিছু সামলাতে পারবেন বলেই অনুমান। পুজোর পর ঘটনাবহুল জীবন। ডাক্তারের নির্বুদ্ধিতার কারণে নতুন নতুন রোগ এবং নার্সিং হোমে নতুন রোগী-বন্ধুলাভ। অধিক ব্যয়ের কারণে স্কচের পরিবর্তে বাংলা পান।

তুলা— এ বছরটা আপনার প্রধানত টিভিতে মেগাসিরিয়াল দেখেই কেটে যাবে। কোনও নায়িকার প্রতি সাময়িক আকর্ষণের কারণে আপনার জীবনযাপনে পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। বহু দিনের কোনও বকেয়া অপমান ফেরত পেতে পারেন। ঈর্ষাকাতর বন্ধুর কলকাঠি সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট সুরা উপহারলাভ। ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারলে বউ এবং প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে শপিং-এ যাবে।

বছরের শেষ ভাগে চারপাশের আবহাওয়া অতি রোমান্টিক হয়ে উঠবে, কিন্তু কুচক্রীদের চক্রান্তে ফোর নাইনটি এইট খাওয়ার মধ্যে দিয়ে আবার বাস্তবে ফিরে আসবেন। তবে এ বছর আপনার স্বাস্থ্য ভাল গেলেও, প্রেমাস্পদকে ঘিরে উদ্‌বেগ গড়ে ওঠার কারণে এটিএম-এর পিন অন্যকে বলে দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। ভেজ চাউমিন এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক— হঠকারিতার কারণে লটারি লাগা টিকিট কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দেবেন। বিশেষ তেল ব্যবহারে পৌরুষ বৃদ্ধির চেষ্টায় জটিলতা সৃষ্টি। আপনাকে সারা বছর মনে

রাখতে হবে যে, কম দামে কেনা কন্ডোমে ফুটো থাকতে পারে। নতুন বাহন ক্রয়ের পরিকল্পনা থাকলে ট্রাক্টরের কথা ভাবুন। বৃশ্চিক রাশির পক্ষে লোহা শুভ, তাই আয়রন ট্যাবলেটের ব্যবসায় ভাল লাভ দৃষ্ট হয়। মোবাইলে পর্ন দেখতে চাইলে দুপুরের মধ্যেই দেখে ফেলুন। মহিলারা চাইলে স্বামীকে না জানিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে সহজেই দেখা করতে পারবেন, তবে পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এ বছরটা বিশেষ শুভ নয়। অবিবাহিত এবং বেকারদের এ বছরটা গত বছরের মতোই কাটবে। নিজেকে আয়নার বেশি না দেখাই ভাল, কারণ সিনেমায় নামতে গিয়ে দেউলিয়া হতে পারেন।

ধনু— মহিলাপ্রিয় সম্পাদকের বাগড়ায় কবি হওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা এ বছর প্রবল। কিন্তু এই আঘাত সামলে নিতে

পারলে ক্রেতাসুরক্ষা আন্দোলনে জড়িয়ে নিজেকে বিখ্যাত করে তুলতে পারবেন। মে মাসের পর থেকে আপনার জীবনে একাধিক মহিলা আসবেন, যাঁরা সকলেই সিভিক পুলিশ। কোনও ব্যক্তির মুখোশ খুলে দিয়ে গণধোলাই খাওয়ার সম্ভাবনা, তথাপি যশকারক বৃহস্পতি অনুকূলে থাকার জন্য কাগজে-টিভিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখের ছবি প্রকাশ। বছরের মাঝামাঝি এইডস হয়েছে ভেবে অহেতুক

অর্থনাশ এবং হয়রানি। দেয়ালির পর থেকে ফেসবুকে সম্মানলাভ, এটিএম-এ টাকা লাভ, সপরিবার তাজমহল দর্শন এবং আধ্যাত্মিক শান্তিলাভ। মাঝেমধ্যে বরবটি ভেবে কাঁচালংকা চিবিয়ে অশ্রুপাত। ডান পায়ে মোজা পরা এড়িয়ে চলুন।

মকর— দাদ, হাজা, চুলকানিতে ভোগান্তি, তাই সারা বছর জল এড়িয়ে চললে ভাল ফল পাবেন। বিবাহযোগ নিশ্চিত হলেও বিয়ের আসরে গিয়ে বউ পালিয়ে যাওয়ার সংবাদে

মনঃকষ্ট। কিন্তু রাজনীতিতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত গোষ্ঠীতে ভিড়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে এ বছরটা সেদিকে মন দেওয়াই বিধেয়। তবে কোনও বেঁটে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে কাট-মানি না খাওয়াই আপনার পক্ষে ভাল হবে। বোমা বাঁধতে গিয়ে প্রিয়জনের হাত উড়ে যাওয়ার খবরে দুঃখ। রাশভারী নেতার পরামর্শে পরনারীসহ সমুদ্রভ্রমণের সুখলাভ। ক্যামেরাধারী ব্যক্তির থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি, অন্যথায় রসাভিসারের চিত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অর্থদণ্ডের সম্ভাবনা। মহিলাদের ক্ষেত্রে সেল্ফি তুলতে গিয়ে গোবরে পা দেওয়ার আশঙ্কা।

প্রাইজের টিকিট কমোডে

কুম্ভ— অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে পাশের বাড়ির বউদিকে প্রোপোজ করতে গিয়ে হাজতবাসের সম্ভাবনা। বন্ধুর বোনের মোবাইল রিচার্জ করাতে করাতে সঞ্চয়ে

টান। কোনও ছলনাময়ীর সঙ্গে চ্যাট করতে গিয়ে ফেসবুক হ্যাক। এসব কাটিয়ে উঠতে পারলেও বছরের অন্তিম পর্বে অকস্মাৎ বাবা হচ্ছেন জেনে মনে মনে বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন। অবসন্ন

অবসন্ন হৃদয়ে হেলমেট ছাড়া বাইক নিয়ে বেরিয়ে ফাইন দিতে হবে। নিকট কোনও বন্ধুর চক্রান্তে বউ আপনাকে মাদকাসক্ত বলে সন্দেহ করবে। কিন্তু জীবনের এইসব ছোট ছোট সমস্যাকে জয় করতে পারলে এ বছর আপনি লাভ করবেন মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা। তখন আপনি নারীহীন জীবনের উপকারিতা বিষয়ে চমৎকার গ্রন্থ রচনা করে অভিনন্দিত হবেন।

হৃদয়ে হেলমেট ছাড়া বাইক নিয়ে বেরিয়ে ফাইন দিতে হবে। নিকট কোনও বন্ধুর চক্রান্তে বউ আপনাকে মাদকাসক্ত বলে সন্দেহ করবে। কিন্তু জীবনের এইসব ছোট ছোট সমস্যাকে জয় করতে পারলে এ বছর আপনি লাভ করবেন মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা। তখন আপনি নারীহীন জীবনের উপকারিতা বিষয়ে চমৎকার গ্রন্থ রচনা করে অভিনন্দিত হবেন। কুম্ভ রাশির মহিলারা আপনাকে গোলাপ দেবে। মনে শান্তি পেতে বলিউডি নায়িকার ছবি দেয়ালে সাঁটুন।

মীন— বাজারের গতিপ্রকৃতি না বুঝে জুয়া খেলে কপর্দকশূন্য হওয়া এবং পুলিশের হাতে পড়ার আশঙ্কা। বাচ্চার স্কুলের মিসের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ থেকে বাচ্চার মায়ের

কাছে প্রবল অপমান এবং সুইসাইডের ভাবনা। কিন্তু অপর কোনও রহস্যময়ীর মুখ আপনাকে রেললাইন থেকে ঠিক ফিরিয়ে আনবে। বছরের তৃতীয়, পঞ্চম এবং একাদশ মাসে উদ্‌বেগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নিজেকে সমকামী বলে মনে হতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাঁরা নিশ্চিন্তে গোটা বছর সিরিয়াল দেখতে পারবেন, এবং প্রচুর সেল্ফি তুলতে পারবেন। তবে যোগব্যায়ামের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বছরটি বিশেষ শুভ। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই মঞ্চে শবাসনের সুযোগ পেতে পারেন। সারা বছর আইসক্রিম গরম করে খাওয়া বিধেয়।

ডুয়ার্স বেড়াতে যাওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সিল্করুট
২ রাত ৩ দিনের ছুটিতে
বেড়াতে চলুন সিল্ক রুট।
২১.০১.২০১৭ ও ১১.০৩.২০১৭
প্যাকেজের খরচ: মাথাপিছু ৪৫০০ টাকা
(শিলিগুড়ি - শিলিগুড়ি)

ডুয়ার্স
১ রাত ২ দিনের ছুটিতে
বেড়াতে চলুন গোরুমারা জঙ্গলে
১১.০৩.২০১৭, ১৫.০৪.২০১৭
প্যাকেজের খরচ: মাথাপিছু ২৭০০ টাকা
(শিলিগুড়ি - শিলিগুড়ি)

ভুটান
সঙ্গে ডুয়ার্স (৬ দিন)
১৪.০৪.২০১৭
প্যাকেজের খরচ: মাথাপিছু ১৩,৫০০ টাকা
(হাসিমারা থেকে)

লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ
২ রাত ৩ দিনের ছুটিতে
বেড়াতে চলুন
১১.০৩.২০১৭, ১৪.০৪.২০১৭
প্যাকেজের খরচ: মাথাপিছু ৪৫০০ টাকা
(শিলিগুড়ি - শিলিগুড়ি)

পেলিং
২ রাত ৩ দিনের ছুটিতে
বেড়াতে চলুন
১৪.০৪.২০১৭
প্যাকেজের খরচ: মাথাপিছু ৫৫০০ টাকা
(শিলিগুড়ি - শিলিগুড়ি)

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

চালশেয় ধরা পড়ে ডুয়ার্সের বদলে যাওয়া জলছবি

মহাকালের রথের চাকা ঘুরেই চলেছে অহর্নিশ। সময় তার নিজস্ব তুলি দিয়ে নিরন্তর আঁচড় কাটছে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে। আমরা বদলাচ্ছি। আমাদের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে বদলাচ্ছে গ্রাম। বদলাচ্ছে শহর। গত তিন-চার দশকে সময়ের হাত ধরে যেমন বিশ্বায়ন হয়েছে, তেমনই সেই সঙ্গে সঙ্গে শুধু মহানগর নয়, বদলে গিয়েছে প্রত্যেকটা গ্রাম, গ্রামান্তর, মফস্‌সল শহর। বদলে গিয়েছে আমাদের ডুয়ার্সও।

যাঁরা ডুয়ার্সের স্মৃতিজীবী মানুষ, তাঁরা জানেন কতখানি বদলে গিয়েছে তাঁদের ডুয়ার্স। আচ্ছা, সময়যানে চেপে আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে যদি ফিরে যাই, তবে কেমন হয়? একটু পুরনো যাঁরা, তাঁদের সকলের মনের কুলুঙ্গিতে সেসব দিনের টুকরোটাকরা ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলো সযত্নে তুলে নিয়ে ঝেড়েঝুড়ে একটা কোলাজ বানাতে দোষ কোথায়? আসুন, আমরা বরং সকলে মিলে একবার সে চেষ্টা করে দেখি।

চল্লিশ বছর আগের কথা। সে বড় সুখের সময়। কোথাও ধোঁয়া নেই, দূষণ নেই, যানজটের ভ্রূকুটি নেই। তখন প্রকৃত প্রস্তাবেই এই ডুয়ার্স 'সবুজে সবুজ নীলিমায় নীল'। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাদা-কালো খবরের কাগজ আসে দু'দিন পর। টিভি আসেনি শহরে। ১৯৮২ সালে পাওলো রোসি যেবার ইতালিকে বিশ্বকাপ জেতাবেন, সেবার দু'-চারটে বাড়িতে সাদা-কালো টিভি আসবে। ছাদে অ্যান্টেনা লাগিয়ে বাংলাদেশ টিভিতে দেখা যাবে সেই ম্যাচ। একটা টিভির সামনে ভিড় জমাবে দেড়শোজন।

তখন আনন্দের উপকরণ সীমিত। বিশাল বাক্সের মতো রেডিয়োতে হেমন্ত-সন্ধ্যা-মান্না-আরতি কিংবা বিনাকা (পরে সিবাকা) গীতমালায় বলিউডি ছবির গান। অল্প বয়সে মল্লিকাবনে যখন প্রথম কলি ধরবে, তখন লং প্লেয়িং রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত শোনা হল নিউটনের ফোর্থ ল। এটা সেই সময়, যখন বিয়েবাড়িতে শংকরের 'চৌরঙ্গী' বা বিমল মিত্রর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপহার দিলে ভুরু কুঁচকে তাকায় না কেউ। বরং খুশিই হয়। দস্যু মোহন আর স্বপনকুমার সিরিজের কাহিনি প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ঠোঁটস্থ।

বিনোদন বলতে সিনেমা হলে গিয়ে উত্তম-সুচিত্রার ছবি দেখা আর ফেরার সময় রেস্তরাঁয় মোগলাই পরোটা। দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চার আনা-আট আনা সাইজের শ্যালক-শ্যালিকার টিম নিয়ে জামাইবাবুদের ছায়াছবি দর্শন। যত বেশি রিলের ছবি, তত বেশি মজা। সিনেমা শুরু হবার সময় ঠাকুরের ছবি দেখালে কপালে

হাত ছুঁইয়ে পেন্নাম ঠোকে শতকরা সত্তরজন। সিনেমা হলে হাউজফুল বোর্ড না ঝুললে সেই 'বই' দেখার আনন্দ নেই। মারামারি করে টিকিট কাটাও সম্ভব নয়। তাহলে? তখন 'বচ্চন' ভরসা। বেলবটম প্যান্ট, টেরিলিনের শার্ট, চোখে সানগ্লাস। গুরুর মতোই কান-ঢাকা চুল। হাইট ছ'ফিট না হলেও কাছাকাছি। অবিকল না হলেও অরিজিনালের সঙ্গে বেশ মিল। দু'টাকার টিকিট আড়াই টাকা। নুন শো-এর সময় গিয়ে বলে রাখলে ম্যাটিনি শো-এর টিকিট কনফার্মড।

থিয়েটারের রমরমা ডুয়ার্সে। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি-মালবাজার-বানারহাট-আলিপুরদুয়ার-কামাখ্যাগুড়িতে নাটকের চর্চা চলছে জোরকদমে— ক্যাপ্টেন হুররা, ছেঁড়া তমসুক, ত্রিংশ শতাব্দী, শুকসারি কথা। শীতকালে বসছে একের পর এক যাত্রার আসর। নটী বিনোদিনী, খোঁড়া বাদশা। তিনদিক খোলা মঞ্চ। ঝ্যাম ঝ্যাম বাজনা। উঁচু গলা কাঁপিয়ে যুধিষ্ঠিরের ডায়ালগ— 'ভীষণ কুরুক্ষেত্র সমরানল নির্বাপিত হয়েছে বটে; কিন্তু প্রাণে শান্তির পরিবর্তে এ কী অশান্তির কালানল!' পাড়ার পুজোমণ্ডপে দুর্গা পুজোর পর বিজয়াদশমীতে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান। মান্না-হেমন্ত-কিশোর কণ্ঠের শিল্পীদের ঘিরে ভয়াবহ উন্মাদনা। লতাকণ্ঠী আর আশাকণ্ঠীদের এক সন্ধেতে চার আসরে গান গাইবার আমন্ত্রণ। শিল্পীর হাতে মিষ্টির প্যাকেট ধরিয়ে রিকশা করে সসম্মানে নিয়ে যায় কমিটির ছেলেরা। মুখে পান, জমকালো পাঞ্জাবি আর চোস্ত পরা তবলাবাদক রিকশার পিছন পিছন সাইকেল চালাতে চালাতে।

গরমের সময় ফুটবল টুর্নামেন্ট। জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে কলকাতার সালকিয়া ফ্রেন্ডস অথবা উয়াড়ির সঙ্গে পাঙ্গা নেবে ভুটানের টিম কিংবা দার্জিলিঙের খেলকুঁদ সংঘ। ক্রিকেট সিজনে দেখা যাবে প্রণব রায়, রাজা ভেঙ্কট, প্রলয় চেল, প্রবীর চেলদের খেলা। সেবার রইরই কাণ্ড। যেন ঊর্ধ্বগগন থেকে নিম্নের উতলা ধরণিতলে নেমে এসেছিলেন একনাথ সোলকার, সেলিম দুরানি, জয়সীমার মতো মহাতারকারা।

শহরের ব্যস্ত চৌমাথায় ওষুধের ডিসপেনসারি। ভদ্রলোক এলএমএফ পাশ, কিন্তু ধন্বন্তরি বলে বিদিত। টিনের লম্বা টানা ঘর, মাটির মেঝে। চোখে চশমা, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক বসে থাকেন দোকানে। জ্বরজারি হোক, ম্যালেরিয়া কিংবা সান্নিপাতিক— তাঁর দেওয়া মিক্সচার যে কোনও অসুখের 'দমদম দাওয়াই'। যেমন উগ্র গন্ধ, তেমনি ঝাঁজালো তেতো তার স্বাদ। খেয়ে অন্নপ্রাশনের ভাত অবধি উঠে আসে।

প্যাথলজি ল্যাব শহরে গুটিকয়েক। দশ বা বারোরকম অসুখের বাইরে লোকের অসুখ করে না। প্যাথলজি পরীক্ষাও সহজ সরল। টিসি-ডিসি-ইএসআর ইত্যাদির বাইরে অন্য কোনও রক্ত পরীক্ষাও যে হতে পারে, কেউ জানেই না। ওষুধের দোকান হাতে গোনা। নার্সিং হোম চোখে দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। চিকিৎসা বলতে জেলা হাসপাতাল।

তিনি ফ্লপ করলে বড় ডাক্তারের শরণাগত হতে হয়। বড় ডাক্তার হাসিখুশি মানুষ। শহরের মানুষ তাঁকে এক ডাকে চেনে। তিনি রিকশায় চেপে রুগির বাড়ি যান। রাতবিরেত হলেও না করেন না। প্যাথলজি ল্যাব শহরে গুটিকয়েক। দশ বা বারোরকম অসুখের বাইরে লোকের অসুখ করে না। প্যাথলজি পরীক্ষাও সহজ সরল। টিসি-ডিসি-ইএসআর ইত্যাদির বাইরে অন্য কোনও রক্ত পরীক্ষাও যে হতে পারে, কেউ জানেই না। ওষুধের দোকান হাতে গোনা। নার্সিং হোম চোখে দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। চিকিৎসা বলতে জেলা হাসপাতাল। রুগি চোখ বুজলে সোজা শ্মশান। 'বলো হরি হরি বোল' ধ্বনি তুলে খই ছেটাতে ছেটাতে কোমরে গামছা বেঁধে খালি পায়ে শবদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে হাঁটা দেবে শ'খানেক জোয়ান ছেলে।

'তুমি আর নও সে তুমি' গানের মতো সেই ডুয়ার্স আর নেই। দিন বদলেছে, চারদিকে হাত-পা ছড়াচ্ছে জেলা শহর। যেদিকে দু'চোখ যায়, রিয়্যাল এস্টেটের বিজ্ঞাপনের ছয়লাপ। জমির মালিক জমি বিক্রি করে দিয়েছেন প্রোমোটারকে। কুতুব মিনারের মতো উঁচু উঁচু বিল্ডিং, দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বাইরে চমকদার ওয়েদার কোট। ঘরের মেঝেতে জয়পুরি টাইলস। বিল্ডিং-এ লিফ্ট আছে। টপ ফ্লোরের পিছন দিকে ছ'শো বর্গফুটের ফ্ল্যাট পেয়েছেন জমির মালিক। সঙ্গে থোক টাকা। আগে অযত্নের ফুলবাগানে ফুটত রাশি রাশি ফুল। এখন এক চিলতে ব্যালকনির টপে একটা প্যাঁকাটির মতো তুলসী গাছ। জমির মালিক বিমা কোম্পানির দুর্বল এজেন্ট। পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি। রংচটা গামছা আর মলিন পাজামা এখনও মেলে দেন সুদৃশ্য ব্যালকনির গ্রিলে।

মিউনিসিপ্যালিটি আয়তনে বেড়েছে। পঞ্চায়েত সরে গিয়েছে দূরে। যেসব এলাকায় আগে শেয়াল ডাকত রাতে, সেখানে ধানজমি বুজিয়ে প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। সেসব প্লট বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে চোখের নিমেষে। কারা কিনছে সেসব? রহস্য ঘনীভূত। ইংরেজি থ্রিলার হলে বলত— দ্য প্লট থিকেনস।

শহর ছাড়িয়ে একটু বেরতেই পরপর দুটো হিমঘর। দিন বদলেছে। শুধু গ্রামের কৃষকরাই চাষবাস করেন না আজকাল। এখন ঢিল ছুড়লে যাঁর গায়ে পড়বে, তিনিই আলু চাষি। জ্যোতি আলুর বিছন কিনে কার্তিক মাসে ফিল্ডে নামেন এঁরা। ভাল বিজনেস। মাস তিনেকের মধ্যেই নগদ প্রফিট। এক গাড়ি ষাট হাজারে বেচতে পারলে ডবল লাভ। আলুর ধসা রোগ হয়ে গেলে অবশ্য গুড়ে বালি। তবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাক, তরমুজেও ইনভেস্ট করছেন অনেকে। শহর ছাড়িয়ে একটু গ্রামের দিকে গিয়ে অন্যের পাঁচ-সাত বিঘা সাইজের পুকুরে মাছের পোনা ছেড়ে মাছ চাষও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আজকাল।

শহর যেখানে হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে, সেখানে রাস্তার ধারে জমি কিনে ফেলে রেখে দিয়েছে অনেকে। একটু এগিয়ে রঙিন গার্ডেন আমব্রেলার নিচে প্লাস্টিকের চেয়ার দেওয়া বার কাম রেস্তরাঁ। দুপুর থেকেই ধাবার বাইরে সার দিয়ে দাঁড়ানো বাইক। হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে কোনও দামি গাড়ি। তন্দুরি রুটি অথবা বাটার নান দিয়ে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান কিংবা চিলি পনির। তড়কা-ডালমাখানি থাকে সাইড ডিশ হিসেবে। গরমকালে চিল্ড বিয়ারের খুব বিক্রি। সন্ধের পর ভিড় আরও বেশি। কলেজে পড়া ছেলেরা দু'শো সিসি-র বাইক চালিয়ে আসে দেড়শো কিমি গতিতে। তাদের কোমর জড়িয়ে থাকে জিন্স আর টপ পরা গার্লফ্রেন্ডরা।

অনতিদূরেই একটা পেট্রোল পাম্প। আগে এটা ধানি জমি ছিল। রাস্তার ধারে জমি কিনে ফেলে রেখে দিয়েছে অনেকে। আলাদা আলাদা সার্ভিস প্রোভাইডারের দুটো মোবাইল টাওয়ার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জমিতে। ফলস্বরূপ কাকপক্ষীরা শহরছাড়া। ইতিউতি ছড়ানো-ছেটানো ধাবা। কিছু কিছু লাইন ট্রাকের ঠিকানা বিশেষ কিছু ধাবা, যেখানে শোনা যায়, অন্য 'আইটেম' পাওয়া যায়। বিভিন্ন বয়সের, বেশি রেটের, কম রেটের সব ধরনের আইটেম। কম রেট হলে মুখে রং মাখা থাকে। বেশি রেটের

ক্ষেত্রে থাকে না। এদের কেউ কেউ বলে 'পাখি'। ধাবার উলটো দিকের পানের দোকানে 'পালং তোড় পান'-এর খোঁজ করলেই সন্ধান মেলে পাখিদের। পালং সম্ভবত পালঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। পালঙ্ক অর্থাৎ কিনা খাট।

মুম্বইয়ের ধারাভির মতো এই ঘিঞ্জি বস্তিই শহরের কাজের মাসিদের আস্তানা। রাস্তা দিয়ে অকাতরে চরে বেড়াচ্ছে শুকর ছানা, নেড়ি কুকুরের দল। একদিকে পড়ে আছে আবর্জনা, কাঁঠালের ভূতি, বেড়ালের শব। ড্রেনের পাশে ইটের দেওয়ালে জলবিয়োগ করছে লোকজন। অ্যামোনিয়ার ঝাঁজালো গন্ধ। স্ত্রীবিয়োগ-অর্শ-ভগন্দর-গুপ্তরোগ নিরাময়ের কাগজ দেওয়ালে সাঁটা। অমুক চিহ্নে ভোট দিন। পূতিগন্ধময় ড্রেনে শুয়ে আছে বেহুঁশ মাতাল। মুখে ভনভন করছে মাছি।

এলএমএফ ডাক্তারের ডিসপেনসারি আর নেই। সেখানে শপিং কমপ্লেক্স। রিকশা চড়ে যে ডাক্তারবাবু রুগি দেখতে যেতেন, তাঁর ছেলে বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছে বিদেশে। সেটা এখন মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। একদম নিচে বহুজাতিক ব্যাঙ্ক। দোতলায় প্যাথ ল্যাব। তিনতলায় বিমা অফিস। যাত্রাগানের চল নেই সেভাবে। থিয়েটার হলে দর্শক সাকুল্যে একত্রিশজন।

শহরের অন্য দিকে বড় বড় হাইরাইজ বিল্ডিং। বেসমেন্টে গাড়ি রাখার জায়গা। ঝাঁ-চকচকে সব গাড়ি। ড্রাইভাররা তাসে মশগুল। খেলুড়ে চারজন, দর্শক ছ'জন। রামি, হাজারি বা টোয়েন্টি নাইন। পয়সা দিয়ে খেলা। খেলতে খেলতেই কারও মোবাইল বেজে ওঠে। নিচু স্বরে সাংকেতিক ভাষায় কথা হয়। শুধু তাস নয়, এখন ক্রিকেট ম্যাচেও টাকা লগ্নি করে অনেকে। বিখ্যাতদের তো বটেই, অখ্যাত প্লেয়ারদেরও ঠিকুজি করে কুষ্ঠির খবর রাখে তারা। লাইনের লোক আছে। সে এসে টাকা নিয়ে যায়, দিয়ে যায়।

অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই বাজার। মাটন, চিকেন, মাছ, ডিম, সবজি, ফলমূল সব পাওয়া যায়। ফ্ল্যাটের স্যারেরা ছুটির দিন টি-শার্ট আর বারমুডা পরে নেমে আসেন বাজার করতে। তাঁদের চোখের নিচে অতিরিক্ত পানভোজনের বাইপ্রোডাক্ট কোলেস্টেরলের ব্যাগ। পাঁঠা কিংবা খাসির চারটে ঠ্যাং চেপে ধরে কসাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট। গলার নলিতে চপার দিয়ে পোঁচ দেয় একজন। বাবুরা তখন সিগারেট ধরিয়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকান। কখনও কখনও আসেন ম্যাডামরা। চোখে-মুখে গত রাতের বাড়তি পেগের আলস্য জড়ানো। মুরগি যখন মাথাহারা কণিষ্ক হয়ে যায়, তখন নাকে রুমাল চেপে নিস্পৃহ চোখে ম্যাডামরা দেখতে থাকেন ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে যাওয়া গোলাপি মাংসের দাবনা। জল ছড়ানো মুরগি জলে চুবিয়ে ওজন বাড়াবার চেষ্টা করলে নিস্পৃহতা ডিঙিয়ে প্রতিবাদ করেন জোর গলায়।

গলির মোড়ে রোজ সকালে ফুলের দোকানে বসে। সোমবার বেলপাতা, ধুতরো, টগর। মঙ্গলবার হনুমানজি আর মঙ্গলচণ্ডী। গাঁদা-রজনিগন্ধার স্টিক। বিষ্যুদবার ফুলের প্যাকেটে দূর্বা ঘাস, আমের পল্লব, তুলসীপাতা, বেলপাতা মাস্ট। শনিবার নীল অপরাজিতা ফুলের মালা। সকলেই আজকাল ধর্ম অন্ত প্রাণ। টিভি দেখে যোগা প্র্যাকটিস। শহর জুড়ে হেল্থ ক্লাবের রমরমা।

প্রত্যেক পাড়ায় গড়ে পাঁচটা করে বিউটি পার্লার। ফেশিয়াল, পেডিকিয়োর, ম্যানিকিয়োর, বডি মাসাজ। বিয়ের কনে সাজাবার দায়িত্ব এদের। নেমন্তন্নবাড়িতে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে পরিবেশন করাবার চল উঠে গিয়েছে। প্রত্যেক গলিতে এখন দুটো করে ক্যাটারার। তবে কাতলা মাছের কালিয়াই হোক কিংবা মাংসের ঝোল— প্রায় প্রত্যেক ক্যাটারারের রান্নার স্বাদ একদম এক। শববাহী গাড়িতে শবদেহ নিয়ে শ্মশানে যান সাকুল্যে এগারোজন নিকটাত্মীয়। তার বেশি লোক হয় না। সকলেই ব্যস্ত আজকাল। তবে হ্যাঁ, পলিটিক্যাল পার্টির কেষ্টবিষ্টু নেতা হলে চিত্রটা একটু আলাদা। সেই নেতা ওজনদার হলে শ্মশানযাত্রীর সংখ্যা সেঞ্চুরিও ক্রস করে যেতে পারে।

হোটেল হয়েছে অনেক। নিয়ম করে জ্যোতিষী আসেন। চুনি-পান্না-পোখরাজ-নীলা ধারণ করলেই সব সমস্যার সমাধান। মামলা-মকদ্দমায় জয় নিশ্চিত, গৃহশান্তি ফিরবে, বেকারের চাকরি হবে, কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। শহরে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল। আরও তিনটে হয়েছে। হলদে স্কুল বাস এসে স্টুডেন্টদের নিয়ে যায়, দিয়ে যায়। আর্থিকভাবে সচ্ছলরা যায় নিজস্ব বাহনে।

শহরের মধ্যিখানে বাংলা মিডিয়াম বহু বছরের পুরনো স্কুল। নিচু ক্লাসের মেয়েদের সাদা জামা, ডিপ ব্লুরের টিউনিক। নাইন-টেন হলে সেই রঙের পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি। এখন লটারি সিস্টেমে ভরতি। স্কুলের সামনে ঘুগনি, ঝালমুড়ি, টিকটিকি লজেন্স আর আলুকাবলির দোকান। ঠেলাতে মোমো, এগ রোল। পাশের স্টেশনারি দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্ক, পাঁচ টাকার টিফিন কেক। পাশের দোকানে মোবাইল গান ডাউনলোড। পানের দোকানে তিন টাকা দামের সিগারেট, পানমশলা, গুটখার ব্যাপক বিক্রি।

স্কুল গেটের পাশে জেরক্সের দোকান। পাশাপাশি দুটো এটিএম কিয়স্ক। বাড়ির মালিকের আগে টিনের ঘর ছিল। ভেঙে দালানবাড়ি করে নিচে এটিএম ভাড়া দিয়েছেন। মাসে পাঁচ হাজার নিশ্চিন্ত। যাঁদের গলির ভিতরে বাড়ি, তাঁরা কেউ কেউ গ্যারাজ করে ভাড়া দিয়েছেন। মাসে দু'হাজার ফিক্সড ইনকাম। কিছুদিন আগেও প্রায় প্রত্যেক রাস্তায় একটা করে মানি মার্কেটিং-এর অফিস ছিল। এখন ঝাঁপ বন্ধ। কবে খুলবে কেউ জানে না।

এলএমএফ ডাক্তারের ডিসপেনসারি আর নেই। সেখানে শপিং কমপ্লেক্স। রিকশা চড়ে যে ডাক্তারবাবু রুগি দেখতে যেতেন, তাঁর ছেলে বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছে বিদেশে। সেটা এখন মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। একদম নিচে বহুজাতিক ব্যাঙ্ক। দোতলায় প্যাথ ল্যাব। তিনতলায় বিমা অফিস। যাত্রাগানের চল নেই সেভাবে। থিয়েটার হলে দর্শক সাকুল্যে একত্রিশজন। শুধুমাত্র কলকাতার নামী নাটকের দল এলে অবশ্য হাউজফুল। এমনিতে টিভি সিরিয়াল ছেড়ে থিয়েটার দেখতে আসার লোক নেই বললেই চলে। পুরনো সিনেমা হলগুলোর দশাও সুবিধার নয়। শহুরে লোক বড় একটা হলমুখী হয় না। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা মানুষজনই বাঁচিয়ে রেখেছে হলগুলিকে।

বচ্চনের সঙ্গেও আর দেখা হয় না। সেই সিনেমা হলটা উঠে গিয়েছে। ওটা ভেঙে তৈরি হয়েছে শপিং মল। এত আলো, এত রোশনাই যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তবে নীল ইউনিফর্ম পরা বয়স্ক সিকিয়োরিটি গার্ডের মুখটা কেমন চেনা চেনা লাগে। কোটরে ঢোকা চোখ, মাথাজোড়া টাক, ভেঙে যাওয়া চেহারায় অভাবের ছাপ স্পষ্ট। সে দিনের টেরিলিনের শার্ট আর বেলবটম প্যান্ট পরা কান-ঢাকা চুলের টগবগে যুবক আজ বৃদ্ধ। কপালে কাকের পায়ের মতো দাগ। মুখোমুখি দেখা হলেও চিনে ওঠা যাবে কি না কে জানে!

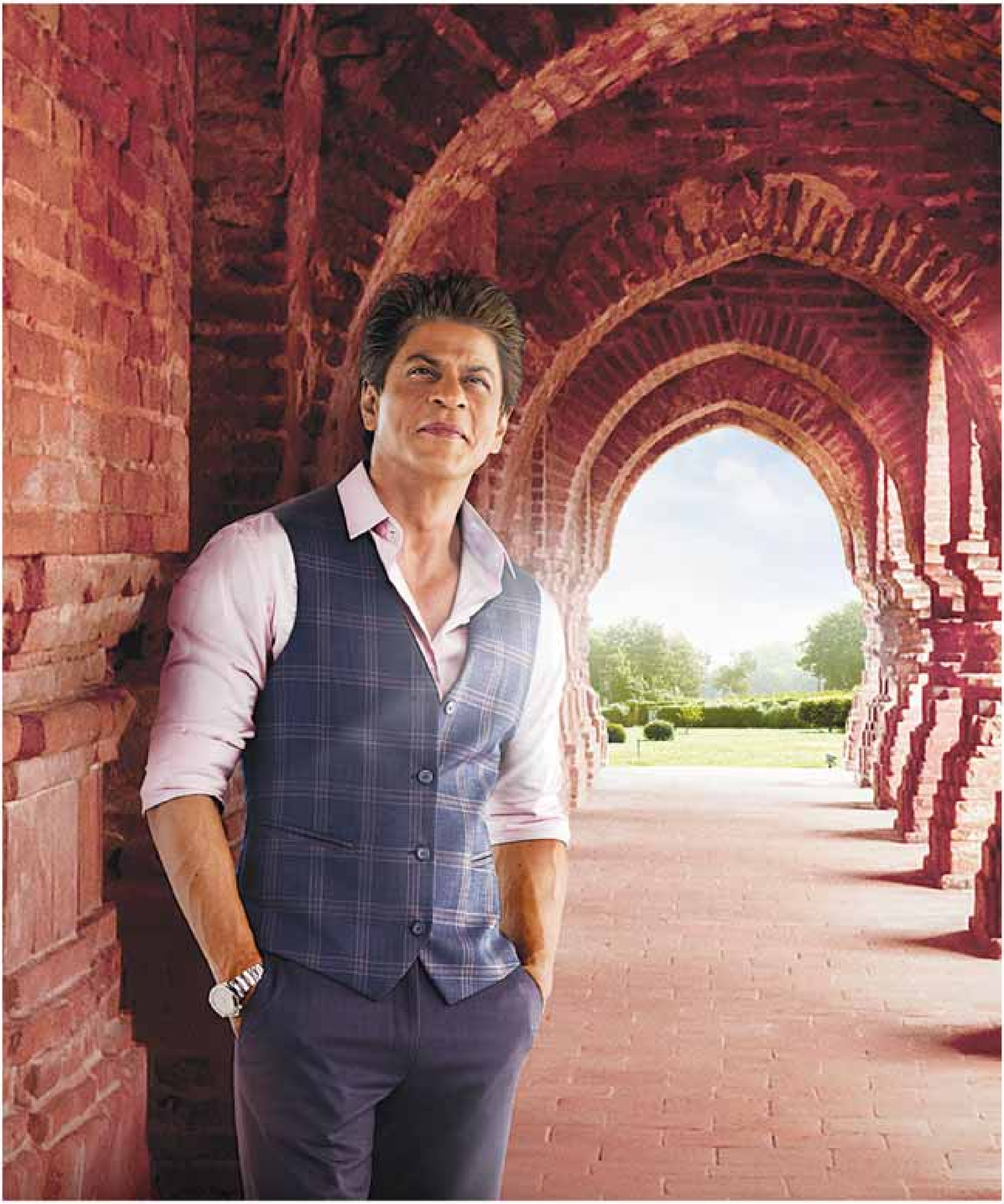

বাঁকুড়ার বন্ধন পোড়ামাটির মন্দিরের চোখ-ভোলানো স্থাপত্য, ধ্রুপদী সংগীতের আবহমান ঐতিহ্য আর কতদিনকার নাম-না-জানা পাহাড়ের সারি - বাঁকুড়ার পরতে পরতে মিশে রয়েছে প্রাচীন বাংলার স্পন্দন। এখানে লাল মাটির রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কানে ভেসে আসে কুমোরের চাকা ঘোরানোর শব্দ, চোখের সামনে প্রাণ পায় পোড়ামাটির ঘোড়া আর মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি সুর তোলে মনের অন্দরে।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

‘স্টেরয়েড’ নগরায়ণে অবরুদ্ধ উত্তরের গেটওয়ে : নতুন বছরে কোনও আলো ?

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল একটা বছর। ২০১৬ থেকে ২০১৭। ফিরে দেখতে হয় আগামী বছরকে নিয়ে ভাবতে। ইতিহাস জানান দেয় ভবিষ্যৎকে। তাই মানুষ খোঁজ করে অতীতকে। চলার পথে প্রয়োজন আগের দিনের ঘটনাগুলিকে ফিরে দেখা। তাই ২০১৭-র ভাবনাকে মনের কোণে জায়গা দিতে ২০১৬-র ছবিটা স্বাভাবিকভাবেই মনের কোণে উঁকি দেয়। সারা দেশের মানুষের ভাবনার সঙ্গে উত্তরবঙ্গবাসীর ভাবনার ছন্দও তো তাই পৃথক হতে পারে না। ২০১৭-র দরজা দিয়ে উঁকি দিতে তাই ২০১৬-র ঘরের অবস্থাকেও একবারের জন্য হলেও দেখে নিতে হয়।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি স্বাধীনতার পর ক্রমশই যেন আরও বেশি করে এক রাজ্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। রাজ্যের যা কিছু, সব কিছুই যে রাজধানীকেন্দ্রিক কলকাতা। রাজধানী কথাটি এসেছে রাজার আবাসস্থান থেকে। রাজা এখন নেই বটে, প্রজাতান্ত্রিক দেশে রাজার অস্তিত্ব না থাকলে রাজোচিত মানসিকতাও থাকবে না এমন কোনও কথা নেই, বরং রাজার পরিবর্তে রাজোচিত মানসিকতা আরও বেশি অহংবোধে। সেখানে সবাই নিজেকে রাজা ভেবে পাশের সবাইকে তাদের প্রজা ভাবে। ফলে শুরু হয় সংঘাতের ভাবনা। জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আমন্ত্রণ জানায় বিচ্ছিন্নতাবাদের।

যা সামগ্রিকভাবে এককেন্দ্রিক রাজ্যের ক্ষেত্রে সত্যি তা একইভাবে রাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে কেন্দ্রীভূত এলাকার পক্ষেও সত্যি। আইনগত বা প্রশাসনিকভাবে স্বীকৃত না হলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি উত্তর ও দক্ষিণ— এই দুই মানসিক বিভাজনে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। রাজ্যটি অবশ্যই এক অখণ্ড রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু কী করে হল এমন মানসিক বিভাজন? এই বিষয়ে অবশ্যই বিস্তারিত গবেষণামূলক আলোচনার প্রয়োজন। এই পরিসরে সেই আলোচনা সম্ভব নয়। তাই আপাতত তথাকথিত উত্তরবঙ্গ ও এই উত্তরবঙ্গের স্বঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি নিয়ে আলোচনাটাকে এই পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

ভারত ভাগের পর পূর্ববাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার পরই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার রূপে শিলিগুড়ির গুরুত্ব উপলব্ধি হতে থাকে। ১৮৬৭ সালের ১ জানুয়ারি কালিম্পং মহকুমাকে দার্জিলিঙের সঙ্গে যুক্ত করে যখন পাহাড়ের সমতলভূমি নিয়ে তরাই মহকুমা গঠন করা হয়েছিল, তখনও শিলিগুড়ি ছিল জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর পরগনার এক অখ্যাত ছোট্ট একটি মৌজামাত্র। ১৯০৭ সালে তরাই মহকুমার অন্তর্গত অঞ্চলকে কার্শিয়াং মহকুমা থেকে পৃথক করে যখন শিলিগুড়ি মহকুমা গঠন করে শিলিগুড়িকে সদর দপ্তর করা হয়।

বাড়ছে শিলিগুড়ি এক অপরিকল্পিত নগর হিসেবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার রূপে চিহ্নিত এই শিলিগুড়ি। মোরগের শরীরে তার লম্বা গলাটাকে টিপে ধরলে বা ছোট একটা কোপ দিলেই যেমন সমগ্র মোরগটার শরীর কিছুক্ষণ ডানা ঝাপটিয়ে নিথর হয়ে যায়, তেমনি শিলিগুড়ির স্পন্দন বন্ধ করতে পারলেই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগই হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন। তাই তার এই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য তাকে বলা হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘চিকেন নেক’।

ভারত ভাগের পর পূর্ববাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার পরই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার রূপে শিলিগুড়ির গুরুত্ব উপলব্ধি হতে থাকে। ১৮৬৭ সালের ১ জানুয়ারি কালিম্পং মহকুমাকে দার্জিলিঙের সঙ্গে যুক্ত করে যখন পাহাড়ের সমতলভূমি নিয়ে তরাই মহকুমা গঠন করা হয়েছিল, তখনও শিলিগুড়ি ছিল জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর পরগনার এক অখ্যাত ছোট্ট একটি মৌজামাত্র। তরাই মহকুমার সদর দপ্তর ছিল আজকের ফাঁসিদাওয়ার কাছে হাঁসখাওয়া। ১৯০৭ সালে তরাই মহকুমার অন্তর্গত অঞ্চলকে কার্শিয়াং মহকুমা থেকে পৃথক করে যখন শিলিগুড়ি মহকুমা গঠন করে শিলিগুড়িকে সদর দপ্তর করা হয়, তখনও শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল এক হাজারের মতন। এমনকি ১৯২১ ও ১৯৪১ সালে এর জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০০০ এবং ১০,৪৮৭। ১৯৩৮ সালে ভিলেজ সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী শিলিগুড়িতে স্থাপিত হয়েছিল একটি ইউনিয়ন বোর্ড। সমুদ্রতল থেকে ৩৯২ ফুট উচ্চতায় গড়ে ওঠা এই ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন জর্জ মেহবাট। জনসংখ্যা তখন ৮,৫৪৯ জন।

১৯৪৯ সালে ৮টি ওয়ার্ড নিয়ে হিলকার্ট রোডের এক ভাঙা বাড়িতে শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ির পুরসভার প্রথম কাজ। এর প্রথম পুরপ্রধান ছিলেন মহকুমাশাসক এস এম গুহ আর উপপ্রধান ছিলেন ডাঃ ব্রজেন্দ্র বসু রায়চৌধুরী।

শিলিগুড়ি বলতে বোঝাত হিলকার্ট রোড ও সেবক রোডের দু'পাশের কিছু বাড়ি, মহানন্দাপাড়া, চারভাঙাটোলা, বাবুপাড়া ও শিলিগুড়ি জংশন (বর্তমানের টাউন স্টেশন) সংলগ্ন সুভাষপল্লি (বাগরাকোট) ও টিকিয়াপাড়া। বাসিন্দা বলতে কিছু রেল কর্মচারী, কাঠ ব্যবসায়ী, রেল মজুর, বাঙালি, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী আর বিহারি মজুর। আজকের এলিটপাড়া, হাকিমপাড়া, আশ্রমপাড়াতে এই প্রতিবেদক ধান চাষ হতে দেখেছে। শহরের মাঝখান দিয়ে হিলকার্ট রোডের উপর দিয়ে দার্জিলিং হিমালয় ন্যারোগেজ রেললাইন। বাজার বা হাট বলতে একটাই। মহাবীরস্থানের পুরনো বাজার। এখানে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। ১৮৮৫ সালে ডি আই ফান্ড হাটে (পুরনো বাজার) স্থাপিত হয়েছিল এখানকার প্রথম স্কুল স্কট মিশন স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আজকের এই শিলিগুড়ির বৃদ্ধি যেন সেই আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো। নগরবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে একটি গ্রামের এমন কলেবর বৃদ্ধি ঘটিয়ে নগরায়ণের রূপান্তরের নজির নেই বলেই বলা হয়েছে। বর্তমানে এর আয়তন তিন বর্গমাইল থেকে ৪১.৯০ বর্গকিমি। এটি যেন হঠাৎ কোনও এক ধাক্কায় গজিয়ে ওঠা নগর। একে স্বাস্থ্য বৃদ্ধির নমুনা হিসেবে হাজির করা যাবে কি না, সে বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে। কারও অবয়বের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর স্টেরয়েডের প্রয়োগে রাতারাতি বৃদ্ধিকে স্বাস্থ্যের সূচক বলা নিয়ে যেমন আছে তীব্র বিতর্ক, তেমনি কোনও পরিকল্পনাহীন এমন একটা নগরায়ণের প্রসারণকে প্রকৃত অর্থে নগরের শ্রীবৃদ্ধি বলা যাবে কি না, তাকে নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ভাবার প্রয়োজন আছে নগর আর নগরায়ণের মধ্যে বুনিয়াদি পার্থক্যগুলি নিয়ে।

'এই দেখো কেমন আমি বাড়ছি মামি'র এক জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনের মতন শিলিগুড়ির নগরপিতারা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে চলেছেন, 'বাড়ছে শিলিগুড়ি'। এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, শিলিগুড়ি শহর বাড়ছে তার কলেবরে এবং জনসংখ্যার দাপটে। উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্সকে সুইটজারল্যান্ড বানাবার স্বপ্ন অনেকদিন ধরেই দেখানো শুরু হয়েছে। সত্যি প্রকৃতি এখানে উজাড় করে দিয়েছে তার সবুজ বিছানো আঁচলের নানা মনোমোহিনীর বৈচিত্রের ডালি দিয়ে। সুইটজারল্যান্ডের মতন এই সৌন্দর্যের হাতছানিতে এখানে গড়ে উঠতে পারে এবং পারত এক বিশাল পর্যটনশিল্প। বাজারে নানা খাদ্যসামগ্রী থাকলেই তো রসনাতৃপ্তির আয়োজন হয় না। তাকে চয়ন করে গৃহিণীর হাতের গুণে রন্ধনশালায় খাদ্যসামগ্রীতে পরিণত করে পরিবেশন না করলে তো তা বাজারেই পড়ে থাকবে।

উত্তরবঙ্গকে সুইটজারল্যান্ডে রূপান্তরিত করতে আল্পস পর্বত থেকে সুইটজারল্যান্ডকে এখানে উপড়ে এনে বসাবার দরকার নেই। প্রকৃতি এই খণ্ডকে দিয়েছে অকৃপণ হাতে তার উপকরণ। দিয়েছে সবুজ পাহাড় আর শ্বেতশুভ্র চূড়ার অপূর্ব দৃশ্য। ঢেলে দিয়েছে খরস্রোতা নদীর ধারা আর তার ধারে গড়ে ওঠা এক নান্দনিক সমতট ও গিরিখাত। সবুজের চাদরের আশ্রয়ে অসংখ্য বন্য প্রাণীর দৃপ্ত বিচরণের মনোহরণকারী রোমহর্ষক আনন্দের তৃপ্তি। সবুজ আঁচলের স্নিগ্ধ ছায়ায় নানা জনজাতির বৈচিত্র। সাজের বেলায় নানা সুরের নান্দনিক অনুভূতি। পাশেই চায়ের পেয়ালায় চায়ের ঘ্রাণের সঙ্গে চা-গাছের কাঁচা পাতার সৌরভ। রাতের আকাশে তারার ঝিকিমিকির সঙ্গে হয় পাহাড়ের নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা, নয়ত সমতলের স্রোতস্বিনীর কল্লোলের সঙ্গে নিঝুম কালো অন্ধকারে জোনাকির আলোর সঙ্গে ঝিঁঝিঁপোকার সিম্ফনি। আর তারই মাঝে প্রকৃতির অপূর্ব সুরমূর্ছনার সঙ্গে যেন তাল মেলাতেই সেই হিমশীতল বনরাজার হুংকারের সঙ্গে আরেক দাবিদারের বৃংহণ। এমন পর্যটনের নান্দনিক ভূমি তো সুইটজারল্যান্ডেও নেই। তবু যে উত্তরবাংলা থেকে যাচ্ছে রূপকথার দুয়োরানির মতন শতচ্ছিন্ন দারিদ্রের পোশাকে।

এই পর্যটন সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি, যার পোশাকি নাম উত্তরবাংলার রাজধানী, তার অবস্থাটা যে এখন রাস্তার ধারে জীবন ও জীবিকার তাগিদে রাতের খরিদ্দার ধরার জন্য মুখে রং মেখে নিজের ক্ষয়রোগের শীর্ণ মুখটাকে ঢেকে আর ফুসফুসের রক্তক্ষরণের চিহ্নটা লাল পানের পিকে ঢেকে রাখার মতন। হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি শহর। হেলে পড়া মৃত ত্রিশূল আলোর স্তম্ভগুলিকে দগদগে ঘায়ের মতন প্রকাশ করে দিয়ে রাতের হ্যালোজেনের উজ্জ্বল আলোয় পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। ডুয়ার্স তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশের জন্য যে এই শিলিগুড়িই একমাত্র প্রবেশপথ। পর্যটকদের এই শহরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে হোঁচট খেতে হয়। এনজেপি-তে গাড়ি, অটো, এমনকি রিকশাওয়ালাদের এবং তাদের সিন্ডিকেটের দাপটের চোখরাঙানিকে কুর্নিশ জানিয়ে শহরে প্রবেশ করতেই গতিময় যানের গতিহীন যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আধুনিক নগরের পরিচয় তার গতি। এই শহরের অপরিসর রাজপথে যন্ত্রযানের সঙ্গে গতির প্রতিযোগিতায় তুলনা চলে কচ্ছপের সঙ্গে। আর ভিড়ের তুলনা চলে একমাত্র পিঁপড়ের সারির সঙ্গে।

বাড়ছে লোকসংখ্যা। আকাশ ঢেকে যাচ্ছে বহুতল ফ্ল্যাটের দাপটে। দ্রুত নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। ধেয়ে আসছে ভূকম্পনপ্রবণ এলাকায় ভূমিধসের প্রবণতা। বাড়ছে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে আর্সেনিকের অবাধ প্রবেশের আশঙ্কা। নেই পয়ঃপ্রণালীর কোনও আধুনিক ব্যবস্থা। জমছে জল অপরিকল্পিত নর্দমায়। মশককুল খুঁজে নিচ্ছে তাদের অবাধ বংশবিস্তারের এই বদ্ধ জলাভূমি।

আধুনিক নগরায়ণের জন্য প্রয়োজন এই শহরের বায়ুপ্রবাহের উপর তার স্থাপত্যের বুনিয়াদ। যেমন বিমানের গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় বায়ুপ্রবাহের জন্য তার নকশার প্রযুক্তি। হিমালয়ের কোলে বায়ুপ্রবাহের বিজ্ঞানকে জানা প্রয়োজন এখানকার বহুতল বাড়ি নির্মাণের নকশার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে। নেই তার কোনও ব্যবস্থা। শহরের ফুসফুস তার মুক্ত ভূমি। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, অন্ততপক্ষে ৩০ শতাংশ এলাকা রাখতে হবে উন্মুক্ত। সেটা কাজ করবে নগরের ফুসফুস হিসেবে। এই নগরের মুক্ত ভূমিকে দেখতে হবে অণুবীক্ষণের সাহায্যে। আধুনিক নগরের বিধান অনুসারে ১৫ শতাংশ রাখা দরকার তার যানবাহন চলাচলের জন্য। এই শহরে রাস্তার অনুপাত মাত্র ৫ শতাংশ। তা-ও রাস্তার দু'পাশ জুড়ে পার্কিং ও হকারের দখলে।

এখানে নেই জীবিকার কোনও উপকরণ। শহর গড়ে উঠেছে ফ্লোটিং ট্রেডের উপর। কোনও কিছু নেই, তাই বাড়ির সামনে করে নেওয়া হয়েছে পান, বিড়ি, সিগারেট বা ছোট্ট কোনও দোকান। এদের নেই ট্রেড লাইসেন্স। তাই কর্পোরেশন জানে না দোকানের সংখ্যা কত। উপায় নেই, তাই গ্রাম থেকে ধেয়ে আসছে জমিহারা জনস্রোত। গড়ে উঠছে অসংখ্য বস্তি। ১৯৭১ সালেও ছিল না কোনও নথিভুক্ত বস্তি। এখন বস্তির সংখ্যা ২০০-র কাছাকাছি। নেই পয়ঃপ্রণালী। নেই শৌচাগার। বাড়ছে অপরাধ। শহরে চলে প্রায় ৪০ হাজার রিকশা। কোথায় যাবে এরা? রুজির নেই কোনও ব্যবস্থা। এর মধ্যেই গড়ে উঠছে নানা ধরনের মাফিয়াচক্র-জমির দালালি থেকে নারী পাচার ও ড্রাগের কারবার। শহরের একমাত্র নদী মহানন্দা। তার চর জুড়ে চলছে অবাধ সিন্ডিকেটরাজ। মহানন্দা হয়ে পড়েছে দুর্গন্ধময় জলের এক শবদেহ।

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি নগরের এই ছবির পরিবর্তন ২০১৭-তে ঘটবে কি না, তারই এখন অপেক্ষা।

সৌমেন নাগ

চা বাগানে নোট বাতিলের ধাক্কা সামলে দিল প্রশাসনিক তৎপরতা

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় এই চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **সপ্তম পর্ব**।

'এখন ডুয়ার্স'-এর ধারাবাহিক কলামে যখন চা-বাগিচা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, সমস্যা-সম্ভাবনা-সমাধানের দিশা খোঁজার চেষ্টায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করে সমস্যার গভীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, তখন কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লাম 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর আঘাতে। না, কালবৈশাখী কেন বলব? যখন নভেম্বরের ৯ তারিখ থেকে আজ এই ডিসেম্বরের ৯ তারিখ— এক মাসের ক্ষেত্রসমীক্ষার সালতামামি নিয়ে বসেছি, তখন ৩১ ডিসেম্বরের বর্ষবিদায়ের দিনে লেখাটা যখন প্রকাশিত হবে, তখন ডিজিটাল ভারত ও স্বচ্ছ ভারতের দিকে অনেকটাই ধাবমান আমরা। ৫০ দিনের কঠোর অধ্যবসায়ের পর ১২০ কোটি আম নাগরিক কি সত্যিই 'অচ্ছে দিন'-এর সন্ধান পাবে, না হাতে থাকবে পেনসিল, সেগুলি নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্‌বাণী জ্যোতিষীরাই করুক। ২০১৭ চা-বাগিচা শ্রমিকদের জন্য কী বার্তা আনে, সেটাই এই সংখ্যার বিচার্য বিষয়।

ডুয়ার্স এবং তরাইতে দুইশতাধিক চা-বাগান। 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর নিয়মের বেড়াজালে মজুরি সংকটে জেরবার চা শিল্পমহল দ্রুত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বড় নোট বাতিলের জেরে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে উত্তরের অর্থনীতির জিয়নকাঠি হিসেবে পরিচিত চা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ১২ লক্ষ শ্রমিক পরিবার। চা-বাগানগুলির ব্যাঙ্ক লেনদেনের শর্ত শিথিল করার দাবি উঠল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মুক্তা আর্য জরুরি বৈঠক আহ্বান করলেন। মালিকপক্ষের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষর প্রতিনিধিরাও বৈঠকে উপস্থিত থাকলেন সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ফলে সৃষ্ট হওয়া সংকট সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। কনসালটেটিভ কমিটি

অব প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন বা সিসিপিএ-র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহাকে দূরভাষে ধরলাম। চা-বাগিচার মালিকপক্ষের শীর্ষ সংগঠনের এই ব্যস্ততম নেতৃত্ব তাৎক্ষণিকভাবে স্বল্প কথায় জানালেন, বাগানগুলির ব্যাঙ্ক লেনদেনে নিয়মকানুন শিথিল করার আরজি জানিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রক, অর্থমন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম দপ্তর, রাজ্য সরকার, রাজ্য শ্রম দপ্তর, টি বোর্ড এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, সর্বাগ্রে প্রয়োজন শ্রমিক সহযোগিতা। নইলে চা-বাগানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার সাম্প্রতিক নিয়ম শিথিল না করলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

বিপর্যয়টা কীরকম? ৯ নভেম্বর বুধবার হাট ছিল ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, সুলকাপাড়া এবং ঝালঙে। বীরপাড়া চৌপথিতে পেয়ে গেলাম তিনটি জায়গার মানুষজনকে। ডুয়ার্সের শতাব্দীপ্রাচীন সুলতানপাড়ার হাটে বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারেরও বেশি দোকানদার আসে। জটেশ্বর থেকে আসা চাল ব্যবসায়ী ঝুনু সাহা দুপুরের মধ্যেই দোকান গুটিয়ে নেন। কেউ দোকান গুটিয়েছেন দুপুরবেলাতেই। কেউ বা সারাদিন শুয়ে কাটিয়েছেন দোকানে বিছিয়ে রাখা মালপত্রের উপর। কোথাও বা খুচরোর অভাবে প্রারম্ভিক বিক্রিটুকুও করতে না পেরে শূন্য হাতেই বাড়ি ফিরেছেন ব্যবসায়ীরা। হাট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানা গেল, এ দিন তাঁদের ব্যবসা অন্যান্য দিনের তুলনায় ৮০ শতাংশ কম। ৫০০ টাকার নোট নিয়ে এসে চাল কিনতে না পারায় পাউরুটি খেয়েই রাত কাটানোর বন্দোবস্ত করেছেন চা-বাগানের বাসিন্দারা। আসলে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ঘায়ে বহু হঠাৎ-বড়লোকের ঘুম যেমন উবে গিয়েছে, তেমনি সংকটে পড়েছেন গরিবগুরবো অনপড় মানুষ। চা শ্রমিক সুষমা মিঞ্জ সাপ্তাহিক মজুরির টাকা পেয়ে দুটো ৫০০ টাকার নোট নিয়ে মঙ্গলবাড়ির হাটে এসেছিলেন চাল কিনতে। বাড়িতে মা, বাবা, ভাইসহ মোট ন'জন সদস্য। চাল কিনতে হাটের প্রতিটি দোকানে ঢুঁ মারলেও ৫০০-র নোট দেখে কেউই আর তাঁর কাছে চাল বেচেননি। যুবতীর কাছ থেকে জানা গেল, চেনাশোনা একটি দোকান থেকে কয়েকটা পাউরুটি বাকিতে নিয়েছেন। তা খেয়েই তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রাত কাটাতে হবে। টেকলাপাড়ার ষাটোর্ধ্ব বাসিন্দা কুনা তাঁতি আক্ষেপ করে বলছিলেন, দেড় দশক আগে যখন রমরমিয়ে চলত বাগানটা, তখন জমিয়ে লক্ষ্মী পুজো হত বাগানের স্টাফলাইনে। বাঙালি বাবুদের গিন্নিরা রীতি মেনেই পূজা করতেন মা লক্ষ্মীর। প্রসাদ নিতে সন্ধ্যা হলেই বাগানের আবাসনে হাজির হত কুনা তাঁতির মতো অনেক শ্রমিকই। দেড় দশক আগে সেই যে লক্ষ্মীছাড়া হল বাগান, কারখানার সাইরেনের ভোঁ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। কুনা তখন প্রৌঢ়। আশায় আশায় থাকতে থাকতে বার্ধক্যে উপনীত হলেন কুনা। বাগানে লক্ষ্মী আর ফিরে এল না। ফলে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এ কিছুই গেল-এল না কুনা তাঁতিদের। কারণ, হাতে কতকগুলো খুচরো টাকা। ৫৩ টাকাই সেই মুহূর্তের সম্বল কুনা তাঁতির। ছেলে-বউ মজুরি না পেলে হয়ত ৫৩ টাকাই চলে যাবে সংসার খরচে, হাতে থাকবে শূন্য হিসেবের খাতা। ডিমডিমা চা-বাগিচার বাসন্তী ইন্দোয়ারের জীবন থেকেও হারিয়ে গেল সুখ-শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য।

চা শ্রমিক সুষমা মিঞ্জ সাপ্তাহিক মজুরির টাকা পেয়ে দুটো ৫০০ টাকার নোট নিয়ে মঙ্গলবাড়ির হাটে এসেছিলেন চাল কিনতে। বাড়িতে মা, বাবা, ভাইসহ মোট ন'জন সদস্য। চাল কিনতে হাটের প্রতিটি দোকানে ঢুঁ মারলেও ৫০০-র নোট দেখে কেউই আর তাঁর কাছে চাল বেচেননি। যুবতীর কাছ থেকে জানা গেল, চেনাশোনা একটি দোকান থেকে কয়েকটা পাউরুটি বাকিতে নিয়েছেন।

মাত্র ৩৫ বছর বয়সের আগেই বাসন্তীর জীবনে বৈধব্যের অন্ধকার নেমে এলে তিনি জীবিকানির্বাহ শুরু করলেন হাঁড়িয়া বেচে। সেই বাসন্তীর কেনাবেচাও বন্ধ। চালই নেই, হাঁড়িয়া খেয়ে হবেটা কী? অর্থাৎ 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' সরাসরিভাবে আঘাত করেছে চা-বাগিচা শ্রমিকদের। বাগান শ্রমিক কালী থাপার রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। ভেবেছিলেন পি.এফ.-এর টাকাটা ব্যাংকে রেখে সুদের টাকায় সংসার চালাবেন। কিন্তু পি.এফ. অফিস জানিয়েছে, আরও কিছুদিন দেরি হবে। পি.এফ.-এর টাকা না জোটার ফলে অনপড় কালী থাপাকে কে বা কারা বুঝিয়েছে, ওই টাকা তিনি আর পাবেন না। ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন কালী থাপা, বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন।

৫০০ এবং ১,০০০ টাকার নোট বাতিলের পরদিন আমি বীরপাড়ায়। বীরপাড়া বাগান খোলার সংবাদে হাসি শ্রমিকসহ পরিবারবর্গ সকলেরই। যদিও খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, প্রচুর শ্রমিক গত দেড় বছরে পেটের দায়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। বীরপাড়া বাগান খোলার সংবাদে আশার সঞ্চার হয়েছে হান্টাপাড়া, লংকাপাড়া ইত্যাদি বন্ধ হওয়া বাগানগুলিতে। ডুয়ার্স এবং তরাইয়ে মোট প্রায় তিনশতাধিক চা-বাগান রয়েছে। দৈনিক ১৩২.৫০ টাকা হারে শ্রমিকরা মজুরি পান বলে মাসিক হিসেব ধরলে তা প্রায় চার হাজার টাকা হয়। বহু শ্রমিক ওভারটাইম করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করেন। শ্রমিক ছাড়াও বাগানে স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মচারী, সহকারী ম্যানেজার, ম্যানেজার, বাবু শ্রেণিসহ আরও অন্যান্য লোকজন আছেন। তাই চা শিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি প্রদান নিয়ে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়। কারণ, অধিকাংশ চা-বাগানেই মজুরি হিসেবে ৫০০ টাকার নোটই বেশি দেওয়া হয়। শ্রমিকরা ২,০০০ টাকার নোটের পরিবর্তে ৫০০ এবং ১০০ টাকার নোট হাতে যাতে বেশি করে পান, এবং কোনও অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করে চা মালিকপক্ষের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অব প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন বা সিসিপিএ। তা ছাড়া যে সকল নথি নিয়ে পুরনো নোট ব্যাঙ্কে জমা দিতে বলা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থায় চা শ্রমিকদের সুবৃহৎ অংশ সড়গড় ছিল না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বাগানগুলি ৫০০ বা ১,০০০ টাকার নোট ফিরিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে সমপরিমাণ নতুন নোট দেবে। কিন্তু সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের নিয়ম অনুযায়ী চা-বাগিচাগুলি টাকা জমা দিলেও সমপরিমাণ অর্থ না তুলতে পারার ফলে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের বোঝাতে

ডুয়ার্স এবং তরাইয়ে মোট প্রায় তিনশতাধিক চা-বাগান রয়েছে। দৈনিক ১৩২.৫০ টাকা হারে শ্রমিকরা মজুরি পান বলে মাসিক হিসেব ধরলে তা প্রায় চার হাজার টাকা হয়। শ্রমিক ছাড়াও বাগানে স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মচারী, সহকারী ম্যানেজার, ম্যানেজার, বাবু শ্রেণিসহ আরও অন্যান্য লোকজন আছেন। তাই চা শিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি প্রদান নিয়ে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়।

সক্রিয় ভূমিকা নেয় স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলিও। তবে তাদের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছিল। তৃণমূল চা মজদুর ওয়ার্কারস' ইউনিয়নের সভাপতি মোহন শর্মার দায়িত্ব ছিল, চা-বলয়ে যাতে নোটের সমস্যা হবার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়ায়, সেদিকে নজর রাখা। দ্রুত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বাগান কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মোহন শর্মাদের ট্রেড ইউনিয়ন-সহ স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলিও।

জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মুক্তা আর্যর আহ্বানে নোট সমস্যা সমাধানে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে জেলাশাসক চা বণিকসভার প্রতিনিধিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর জানিয়ে দেন মজুরি প্রদান সুনিশ্চিত করার জন্য। প্রশাসনিক বৈঠকে অতিরিক্ত জেলাশাসক ডঃ বিশ্বনাথ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে, টি অ্যাসোসিয়েট অব ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জলপাইগুড়ি জেলার চিফ ম্যানেজার অলদি বিশ্বাস প্রমুখর উপস্থিতিতে জানানো হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নির্দেশনামা এলেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মজুরি দেওয়ার জন্য টাকা হাতে পেয়ে যাবেন চা-বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষগুলির প্রতিনিধিরা। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ করণম জানান, চা মালিকদের সংগঠন যে তালিকা প্রদান করেছে, তার ভিত্তিতেই শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে জেলাশাসক মুক্তা আর্য এবং দেবীপ্রসাদ করণমের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা জানান, ৬২টি চা-বাগিচার মধ্যে ৫৫টি মালিকপক্ষ চালান, যার মধ্যে ৩৫টি চা-বাগানকে মজুরি দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল আগেই। পরবর্তীকালে আরও ১৩টি বাগানের জন্য ছাড়পত্র এসে গিয়েছে। বাকি ৭৭টি বাগানও দ্রুত ছাড়পত্র পেয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্য ক্যাবিনেটের চা ও পাটশিল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠীর আমন্ত্রিত সদস্য তথা জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা না থাকার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীও শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য ব্যয় হওয়া প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলি সেই মুহূর্তে দিতে পারবে না জেনে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। বাস্তবে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরবর্তী সাত দিন এবং পর্যায়ক্রমে আরও সাত দিন, অর্থাৎ প্রায় দুই সপ্তাহেও চা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য খুচরো টাকার সমস্যার সমাধান হয়নি। এর জেরে সমস্যায় পড়েন জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদয়ার জেলার তিন লক্ষাধিক শ্রমিক। আসামের আদলে চা-বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষগুলি মজুরি খাতের অর্থ জেলাশাসকের বিশেষ অ্যাকাউন্টে জমা দেবার জন্য বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে বণিকসভার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চা-বাগানের ম্যানেজাররা ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তরে নিজ নিজ চা-বাগানের কর্মরত শ্রমিকদের তালিকা জমা দেন, এবং মজুরি খাতে কত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তা-ও জানিয়ে দেন। অথচ অর্থ দপ্তরের বিশেষ ছাড়পত্র না আসার ফলে বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষগুলি মজুরির অর্থ জেলাশাসকের অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারেননি।

'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ইন কারেন্সি' নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন হাল না ধরলে পরিস্থিতি হয়ত অন্য দিকে মোড় নিত। টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার সচিব রাম অবতার শর্মা, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব সুমন্ত গুহঠাকুরতা, আইটিপিএ-র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার অমিতাংশু চক্রবর্তীরা বাগানভিত্তিক মজুরি খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ডেপুটি লেবার

কমিশনারের দপ্তরে জানান। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মুক্তা আর্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে জানান। অর্থাৎ মজুরি খাতে টাকা না পাওয়ায় চা-বাগিচা শ্রমিকরা যে সমস্যায় পড়েছেন তা মেটানোর জন্য প্রশাসন সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে অর্থ দপ্তরের বিশেষ ছাড়পত্র পাওয়ার প্রচেষ্টা নেয়। মালিকপক্ষও জানান, মজুরি খাতের অর্থ জেলাশাসকের বিশেষ অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য আদেশ এলেই তা জমা দেওয়া হবে। কথা হচ্ছিল অমিতাংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁর মতে, তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত বাগানগুলির অনেকেই মজুরি এবং বেতনের টাকা সরিয়ে রেখেছিল। পুরনো নোট বদলে যাতে দ্রুত ৫০০ এবং ১০০ টাকার নোট দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হবার কথাও ভেবেছিলেন। অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকার কারণে ব্যাঙ্কগুলিও কত দূর পর্যন্ত কী করতে পারবে, সেই ব্যাপারেও তিনি উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার অনাদি বিশ্বাসকে যখন টেলিফোনে ধরলাম, তখন তিনি চা নিলামকেন্দ্রের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে জানা গেল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়ার আদেশনামা সম্পর্কিত পরিবর্তিত নির্দেশাবলি এবং টাকা ব্যাঙ্কের কাছে এলেই তা বাগানগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সেই টাকা হাতে পেয়ে যাবেন বাগানের স্বীকৃত প্রতিনিধিরা।

চা-বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি খাতের অর্থ যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলাশাসকদের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়, তার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে অর্থ দপ্তর। রাজ্যের অর্থসচিব এইচ কে দ্বিবেদীর স্বাক্ষরিত আদেশনামায় নোট বাতিলের জেরে চা শ্রমিকদের মজুরি দেবার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সসমস্যা সমাধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে চা-বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষকে জেলাশাসকের অ্যাকাউন্টে মজুরি খাতের অর্থ জমা দিতে বলা হয়। অর্থ দপ্তরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত আদেশনামা জারি করে তার অনুলিপি পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার জেলাশাসকদের কাছে। অর্থাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন হাল না ধরলে পরিস্থিতি হয়ত অন্য দিকে মোড় নিতে পারত। নির্দিষ্ট এলাকার চা-বাগিচার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে বিশাল অঙ্কের নগদ অর্থ জমা

দেওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ধৈর্য সহকারে শ্রমিক-মালিক-সরকারি প্রতিনিধি-জেলা প্রশাসন-ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি হাসিমুখে কষ্ট স্বীকার করে যেভাবে সরকারি সিদ্ধান্তকে সহযোগিতা করেছেন তা এক কথায় অসাধারণ!

৫০০ এবং ১,০০০ টাকার নোট বাতিলের জেরে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ায় শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে সমস্যা সৃষ্টি হয় চা-বাগিচাগুলিতে। কারণ বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারি অ্যাকাউন্ট মারফত মজুরি বাবদ টাকা তোলার জন্য চা-বাগিচাগুলিতে ছাড়পত্র দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। নির্দেশিকা জারির পরে চেক জমা দিয়ে বা আরটিজিএস করে সংশ্লিষ্ট চা-বাগিচাগুলি জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট করে দেওয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকা জমা দিলে সেই টাকা চা-বাগানগুলির প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা এসে পড়ামাত্রই চা-বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি দ্রুত পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজে হাত দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জলপাইগুড়ি শাখায়, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের বানারহাট শাখায়, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মাল শাখায় টাকা তোলার জন্য বাগানগুলি প্রয়োজনীয় নথিও জমা দেয়। জেলা প্রশাসনের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা পেয়ে ১৯ নভেম্বর থেকেই শ্রমিকদের বকেয়া সাপ্তাহিক মজুরি মেটাতে শুরু করে চা-বাগিচাগুলি। আলিপুরদুয়ারের মেচপাড়া, পাটকাপাড়া, দুয়াপাড়া, দলগাঁও, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স, মথুরা এবং জয়ন্তি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের অ্যাকাউন্ট মারফত মজুরি বাবদ জমা দেওয়া টাকা হাতে পেয়ে যায়, এবং শ্রমিকদের বকেয়া সাপ্তাহিক মজুরি মেটাতে শুরু করে।

সমস্যা সৃষ্টি হয় উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদেশনামায় উত্তর দিনাজপুর জেলার নাম না থাকার ফলে ওই জেলার ইসমালপুর মহকুমার বেশ কিছু বড় এবং ছোট চা-বাগিচায় বেতন এবং মজুরি প্রদানে সমস্যা দেখা দেয়। কোচবিহারে নির্বাচনী আচরণবিধি থাকার ফলে সেখানকার জেলাশাসকও আদেশনামা কার্যকর করতে সমস্যায় পড়েন। তবে পরবর্তী নির্দেশনামা এবং প্রশাসনিক আদেশের পর সমস্যা সমাধানে সরকারি তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। চা শ্রমিক ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে মজুরি সমস্যা নিয়ে জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল কমিশনার বরুণ রায়ের সঙ্গে দেখা করা হয়। দার্জিলিঙের জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব, উত্তর দিনাজপুররের জেলাশাসক আয়েষা রানি টি বোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে সমস্যা সমাধানে তৎপর হন। ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীও প্রশাসনের সঙ্গে ক্ষুদ্র চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে খুচরো টাকার অভাবের বিষয়টি আলোচনা করেন। ক্ষুদ্র চা-বাগিচার ৬৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সমস্যার বিষয়েও জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমে আরটিজিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বাগান কর্তৃপক্ষ জেলাশাসকের সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ামাত্র ব্যাঙ্ক থেকে সমপরিমাণ নতুন নোটে নগদ অর্থ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হতে লাগল। তাই এক কথায় বলা যায়, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মোকাবিলায় যদি জরুরি ভিত্তিতে 'সার্জিক্যাল অপারেশন' করা না যেত তাহলে ডুয়ার্সের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারত।

দলগাঁওয়ের দুই মিচিলিংমা তামুধে

বনেবাদাড়ে ঘুরতে হলে ডুয়ার্স। চা-বাগান দেখতে হলেও ডুয়ার্স। নদী কেমন করে তার বাঁকা শরীর নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে, সেই মোহময়ীকে চোখ মেলে দেখতে হলেও ডুয়ার্স। প্রভাত সূর্যের প্রথম প্রকাশ অনন্ত আকাশে। দু'চোখের পাতায় সেই রঙের খেলা ভাসিয়ে দিতে চাইলে চলে আসুন ডুয়ার্স। অস্তাচলে তলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বিষণ্ণতার প্রলেপ অনুভব করতে হলেও এই ডুয়ার্স। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও যে ডুয়ার্স আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, সে শুধু নির্জনতায় মোড়া। নৈঃশব্দ্য সেখানে কোল পেতে বসে আছে অতিথিদের বিশ্রাম দেবার জন্য। মস্ত শহরের মস্ত মস্ত কংক্রিটের দেওয়াল টপকালেই সামনে উন্নতমানের ম্যাস্টিক রোড। সেখানে সারাদিন, সারারাত গাড়ির হর্ন আর ধুলো-ময়লার কম্বলে মোড়া একপ্রস্থ দমবন্ধ করা বাতাসের আস্তরণ। একটু তো ছুটি নিতেও ইচ্ছে করে এসবের কাছ থেকে। ডুয়ার্স ডাকছে। চলে আসুন। চাপড়ামারি ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে হবে গৈরীবাস পর্যন্ত। গৈরীবাস থেকে ডান দিকে চলে গেলে ঝালং আর বাঁ দিকে চার কিলোমিটার গেলেই দলগাঁও। চুপ করে কান পাতলে অল্পস্বল্প পাখির ডাক শুনতে পাবেন শুধু। পাহাড়ের উপর গ্রাম। মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষজন। কয়েক ঘর নেপালি পরিবার। তারাই তাদের বাড়িগুলিকে বানিয়ে ফেলেছে অতিথিদের থাকার জায়গা। হোমস্টে। নিজেরাই রান্নাবান্না করে পর্যটকদের জন্য। এইরকম অতিথিপরায়ণ পরিবার নিজেদের বাড়িটিকে কাজে লাগিয়ে নিজের গ্রামের সৌন্দর্যকে যেমন পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, তেমনি আবার টাকার অঙ্কে হিসেব করলে তারাও একটি বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছে। এতে দু'তরফেরই লাভ। এখানে দু'টি হোমস্টে আছে, 'মিচিলিংমা হোমস্টে' আর 'তামুধে হোমস্টে'। মিচিলিংমা নিয়ে জিজ্ঞেস করাতে একটা মজার ব্যাপার জানতে পারলাম। মিচিলিংমা একটি ফুলের নাম। যদি ইন্টারকাস্টে লাভ ম্যারেজ হয় তাহলে বরকে এই মিচিলিংমা ফুল সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করতে যেতে হয়। কী কাণ্ড! হোমস্টের মালিক সংগ্রাম নিজেই বলে হাসছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরাও কি...? লজ্জা পেয়ে সংগ্রাম বলল, না ম্যাডাম, আমরা তো ইন্টারকাস্টে বিয়ে করি না। আমি রাই আর ও গুরুং।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে চলে যেতে হবে কাছেই ভিউপয়েন্টে। উঁচু একটি ওয়াচটাওয়ার বানানো। তার উপর

থেকে সামনে পাহাড়ের সারিগুলি একে অপরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে তাকালে অনেকটা বিস্তৃত পরিসর দেখে মনটাও যেন ব্যাপ্ত হয়। ইচ্ছে করছিল সারাদিন শুধু বসেই থাকি। যদি কারও লেখালেখির শখ থাকে তাহলে তার জন্য এটি একেবারে তীর্থক্ষেত্র। তবে নৈঃশব্দ্যপ্রিয় মানুষের জন্যেই এই ভিউপয়েন্ট। হোমস্টে থেকে ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত যেতে গিয়ে সারাটা পথ চোখে পড়ছিল এপিকাকের চাষ। এটি একরকম মেডিসিনাল প্লান্ট। কাছাকাছি দেখার জায়গায় যেতে চাইলে সিঙ্কোনা প্লান্টেশন, রঙ্গো মনাস্ট্রি ইত্যাদি দেখা যেতেই পারে। আরও একটু বেশি ইচ্ছে করলে ন্যাওড়া ভ্যালিতে ট্রেক করতে পারেন। কিংবা জলঢাকা নদীর তীরে ক্যাম্প, রক ক্লাইম্বিং ইত্যাদি-সহ অ্যাডভেঞ্চারেরও ব্যবস্থা আছে। হোমস্টেতে জানালে তারাই এই ট্রেক কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা করে দেবে। দলগাঁওতে থেকে দেখতে যেতে পারা যায় ভারতের প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 'জলঢাকা প্রজেক্ট'। কাছাকাছি আরও অনেক কিছুই দেখার আছে। আছে বেশ কিছু বেড়ানোর জায়গাও (যেমন— সামসিং, সুন্তালাখোলা, প্যারেন, ঝালং, বিন্দু, ন্যাওড়া ভ্যালি ইত্যাদি)। আগেই বলেছি, প্রাচীনতম সিঙ্কোনা চাষও দেখার জায়গার মধ্যেই পড়ে। হোমস্টে দু'টিতে থাকার জন্য যে ঘরগুলি

আছে, সেগুলি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ের মানুষরা বড্ড ফুল ভালবাসে। এদের প্রত্যেকের বাড়িতেই নানা রঙের ফুলের টব। যত্ন করে তৈরি করা গাছগুলোতে থোকায় থোকায় ধরে আছে রংবেরঙের ফুল। ফুল ছাড়াও কিচেন গার্ডেনের প্রতিও আছে ভালবাসা। ঘরের সামনেই এক ফালি জায়গা ঠিকঠাক করে নিয়ে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাক, ধনেপাতা, লাল শাক ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজি নিজেরাই ফলিয়ে নেয়। আসল কথা হল, পরিশ্রমটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। এরা কষ্ট করতেই অভ্যস্ত। হোমস্টেতে থাকার জন্য যেসব টুরিস্টব আসেন, তাঁদের খাওয়াদাওয়াসহ সমস্ত বাজার আসে মাসে এক-দু'বার, শিলিগুড়ি থেকে। দলগাঁওতে থাকতে হলে দুটো দিন অন্তত হাতে রাখা ভাল। যোগাযোগ ঃ মিচিলিংমা ৮১৪৫৫৬১৬৬৫, তামুধে ৮৩৭২৮৫৬০৮৭।

শ্বেতা সরখেল

ছবি: অতনু সরখেল

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch

(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

দেবপ্রসাদ রায়

লোকসভা নির্বাচন আবার ঘনিয়ে আসছে। দিল্লিতে রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি লেখক সতর্কভাবেই নিতে চাইছেন, কিন্তু কাঁটার কি অভাব থাকে? এর মধ্যে তিনি লিখে ফেলেছেন আরও একটি পদ্য, যা দলের কর্মীদের মুখে মুখে ঘুরত তখন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তীব্র উত্তেজনাপ্রবণ। আবার নায়িকার ভূমিকায় উঠে আসছেন ইন্দিরাজি। প্রণব মুখোপাধ্যায় কাকে বলেছিলেন, জিতি বা হারি, আমিই দেশের পরবর্তী অর্থ মন্ত্রী। এ কি আবেগ, নাকি তীব্র আত্মবিশ্বাসের ফল? খুলে যাওয়া স্মৃতিপাতা উজ্জ্বলতর এবার।

২৩

শাহ কমিশন, চিকমাঙ্গালুর থেকে জয়ী হয়ে আসবার পরেও পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার, অকারণে গ্রেপ্তার— জনতা সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপগুলো মানুষের মনে জরুরি অবস্থা নিয়ে যে ক্রোধ ছিল, তা দ্রুত ভুলতে শুধু সাহায্য করেনি, ইন্দিরাজির প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলছিল। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতবাদের দলগুলি শুধুমাত্র ইন্দিরাজির বিরোধিতা করবার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে একজোট হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রথম থেকেই 'ঘরের ভিতর ঘর'-এর অভিযোগে 'জনসংঘ' অভিযুক্ত হচ্ছিল। আজকের বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়ম স্বামীর তখন দাবি ছিল, জনতা দলে থাকলে আরএসএস-এর সঙ্গে থাকা চলবে না— যা সংঘের পক্ষে মানা কোনওমতেই সম্ভব ছিল না।

একদিকে মতাদর্শগত অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, অন্য দিকে চরণ সিংহের অন্তত একবারের জন্য হলেও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অদম্য ইচ্ছে এই 'খিচুড়ি সরকার'-এর ভিতকে ক্রমশ নড়বড়ে করে তুলেছিল। কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছিলাম, সঞ্জয়জির সঙ্গে নাকি রাজনারায়ণের গোপন মিটিং হয়েছে। হোক বা না হোক, মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়াতে গুরু (চরণ সিং) ও চেলা (রাজনারায়ণ) দু'জনেই ফুঁসছিলেন— সঞ্জয়জি তাতে হয়ত খানিকটা বাতাস দিয়ে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে দলের ভিতর বিভাজন ও বিকল্প সরকার ১৮ দিনের জন্য ক্ষমতায় এল। ওয়াই ডি চ্যবনের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস, তারাও তাতে শামিল হল। এই রাজ্য থেকে সৌগতদা মন্ত্রী হলেন। তবে ১৮ দিন হলেও মাসটা আগস্ট ছিল বলে লালকেল্লা থেকে ১৫ আগস্ট চরণ সিং জাতির প্রতি ভাষণ দিতে পেরেছিলেন।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারা যাবে না বুঝে চরণ সিং মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করাতে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এই প্রেক্ষাপটে সে সময়ে দলীয় মুখপত্রে ('নতুন বাংলা'য়) আমার রচিত নিচের কবিতাটি কর্মীদের ভিতর বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—

চরণ সিংহের পরম চেলা
রাজনারায়ণ কুস্তিগির
একে-ওকে দিতেন গালি মাফ হত
তার গুস্তাখির
না বুঝে তার ওজনখানা দিলেন
গালি দেশাইকে,
সঙ্গে থোড়া রগড়ে দিলেন
চন্দ্রশেখরমশাইকে।
গরম গরম পেশাব খেয়ে
দেশাই ছিলেন মেজাজে,
দেখতে গেলেন কাণ্ডখানা
বিদেশ থেকেই কাগজে।
ফিরে এসেই দিলেন কেটে গুরু-চেলার
নাম দুটো।
ছাড়তে হল গদি তাদের গ্যাস বেলুনের
ছাদ ফুটো।
তুলতে হল পটোল তবু পেলেন না তো
অটলকে,
খেপে গিয়ে চরণ বুড়ো বলেন ডেকে
সকলকে।
নানাজি ও মোরারজি
নয়কো মোটেই ভিন্ন,
এক হয়েছে আমার পিছে
বাঁশটি দেবার জন্য।
পরোয়া নেই লড়াইটাকে চালিয়ে যাব
একসাথে,
ওস্তাদিটা দেখিয়ে দেব এই বয়সেও

শেষ রাতে।
দেখে শুনে চ্যবন ভাবেন
এমন হলে মন্দ কী
ঢুকে পড়ি মন্ত্রীসভায়
দলটা দিয়ে বন্ধকি।
'জনতা' ও 'খাস জনতা'
মিলেমিশে দুই ভাইয়ে
চালিয়ে নেব বছরকয়েক
না তাকিয়ে ডান বাঁয়ে।
সমাজবাদের বুলি, আওয়াজ,
ঢুকিয়ে রাখি সিন্দুকে,
গদি পাওয়াই আসল পাওয়া
গাল দেয় দিক নিন্দুকে।

১৯৮০-র নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-র স্লোগান ছিল, 'ইলেক্ট এ গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস'। একটি বাক্য, কিন্তু ইলেকট্রিফায়িং এফেক্ট ছিল বলেই ৩৫৪ জন সদস্য নিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন। যদিও এ রাজ্য থেকে জয়ী হয়েছিলেন মাত্র চারজন— অশোক সেন, আনন্দগোপাল মুখার্জি, বরকতদা ও গোলাম ইয়াজদানী।

নিজের সুপ্ত বাসনাটা জানিয়েছি। মনোনয়ন নিশ্চিত করতে দিল্লিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে, আর জয়ী হবার জন্য রাজ্যে সক্রিয় থাকতে হবে। ঠিকই চলছিল। এবং '৮০-তে মনোনয়ন পাওয়ার দোরগোড়ায় এসেও গিয়েছিলাম। কিন্তু বাদ সাধল আমার নিজের একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। যদিও আজও আমি মনে করি, সে সময়ে আমার সে প্রতিবাদ সঠিক ছিল।

এই রাজ্যে প্রিয়দার প্রভাব কখনওই উপেক্ষা করার মতো ছিল না। কারণ '৬৭-র ছাত্র যুবর আন্দোলন ওঁর নেতৃত্বেই হয়েছিল। এবং তার ফলশ্রুতিতে বাংলায় কংগ্রেস আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সঞ্জয় গান্ধি তাঁকে অসম্মানজনকভাবে পদ থেকে অপসারিত করেছিলেন— এ তথ্য কারও অজানা ছিল না। তাই রাজ্যে সঞ্জয় গান্ধি অনেকদিনই কংগ্রেসের মানুষের কাছে খলনায়ক হিসেবে বিবেচিত হতেন। এই রাজ্যে তাঁর দুই বাহু ছিল কমল নাথ ও অভীক সরকার। স্বাভাবিকভাবেই এঁদের প্রতি ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেসের সদস্যদের একটা বিদ্বেষের মনোভাব ছিল। ক্ষমতায় আসার পর বাম-সরকার কতকগুলি কমিশন গঠন করে। তার ভিতর শর্মা কমিশন ছিল, মূলত জরুরি অবস্থার সময় কমল নাথ কীভাবে ক্ষমতা-বহির্ভূত শক্তি হয়ে বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটিয়েছেন, তার তদন্তের দায়িত্বে।

রাজ্য যুব কংগ্রেসে কমল নাথের একজন বেতনভোগী পদাধিকারী ছিল, রঞ্জন ভট্টাচার্য। সে পরে বরকতদার সিএ হিসেবে যথেষ্ট ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। আর আমি

রাজ্যে সঞ্জয় গান্ধি অনেকদিনই কংগ্রেসের মানুষের কাছে খলনায়ক হিসেবে বিবেচিত হতেন। এই রাজ্যে তাঁর দুই বাহু ছিল কমল নাথ ও অভীক সরকার। ক্ষমতায় আসার পর বাম-সরকার কতকগুলি কমিশন গঠন করে। তার ভিতর শর্মা কমিশন ছিল, মূলত জরুরি অবস্থার সময় কমল নাথ কীভাবে ক্ষমতা-বহির্ভূত শক্তি হয়ে বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটিয়েছেন, তার তদন্তের দায়িত্বে।

যে বরাবরই বরকতদার চক্ষুশীল ছিলাম, তার পিছনে রঞ্জনের লাগাতার কানভাঙানিও একটা বড় কারণ ছিল। সত্যিই, পরে মনে হয়েছে, উত্তেজনার বশে অনেক সময় অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি, তার মাশুল পরে গুনতে হয়েছে, যা না করলেও হত। এরকমই একটা ভুল হয়েছিল অমর সিংকে কেন্দ্র করে।

রথ তখন সভাপতি। আমরা ওর প্রথম দিন থেকে সাথি। ওর প্রথম কলকাতা আগমনে আমরা বিমানবন্দরে ওকে আনতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি একপাশে অমর সিং মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে চিনতাম অন্যভাবে। বড়বাজারে ওর বাবার একটা গামছার দোকান ছিল, ৮ ফুট বাই ১০ ফুটের। অশোক সিং বলে একজন মাসলম্যানের স্কুটারের পিছনে ঘুরত, আর নেতাদের খিদমত করত। ওকে এয়ারপোর্টে দেখে আমার 'মটকা' গরম হয়ে গেল। আমি বললাম, 'অমর, তুই এখানে?' ও বলল, 'রথ সাহেবকে নিতে এসেছি।' আমি বললাম, 'তুই কে? তোর সঙ্গে রথ কেন যাবে?' ও বলল, 'আমি ফোনে রাজি করিয়েছি।' আমি ওর হাত থেকে মালাটা কেড়ে নিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে ওকে এয়ারপোর্ট থেকে বার করে দিলাম। তার পরে ওর উত্থান সকলের জানা। আর প্রভাবশালী হয়ে আমার যে ক্ষতিটা ও করেছিল, সেটা পরে বলব।

যা-ই হোক, কমল নাথের প্রতি আনুগত্য দেখাতে রঞ্জন একদিন রাজ্য যুব কংগ্রেসের নাম করে কিছু চেলাচামুণ্ডা নিয়ে গিয়ে শর্মা কমিশনে ভাঙচুর করল। আর 'যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। কমল নাথ জিন্দাবাদ' স্লোগান দিল। আমি খবরটা পত্রিকাতে পড়েই বিবৃতি দিলাম, এই কর্মসূচি যুব কংগ্রেসের ছিল না, এবং কমল নাথ কংগ্রেসের কেউ নন। যদিও পরবর্তীতে উনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে উপর্যুপরি সাতবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছেছিলেন।

সেই বিবৃতির মূল্য দিলাম '৮০-র মনোনয়নের সময়। যদিও সঞ্জয়জি নিজেই বলেছিলেন, 'তুমি লোকসভায় প্রার্থী হতে চাইলে নিজের আসনের বিন্যাস নিয়ে আমার কাছে এসো।' আমি উৎসাহের সঙ্গে জলপাইগুড়ি লোকসভার 'মাইক্রোলেভেল' ইনফর্মেশন নিয়ে যখন দিল্লি গেলাম, সঞ্জয়জির সঙ্গে দেখা করাতে উনি বললেন, 'মিঠু, আমি তোমাকে প্রার্থী করতে পারব না, কারণ কমল নাথ তোমায় চাইছে না। আর ওকে বিরাগভাজন করে তোমাকে দাঁড় করানো ঠিক হবে না।'

'যা ঠিক, আপনি নিশ্চয়ই তা-ই করুন।' বলে আমি চলে এসে ঠিক করলাম প্রচারে সময় দেব। এ দলে মান-অভিমানের কোনও জায়গা নেই।

'৮০-র নির্বাচনটায় আমি এ রাজ্যেই প্রচারে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলাম। বেশিটা সময় মুর্শিদাবাদে, কিছুটা সময় বোলপুরে। জনসভাগুলি দেখে মনে হত যে সাত্তারদা মুর্শিদাবাদে অবশ্যই জিতবেন, যদিও প্রণবদার আসনটা প্রথম থেকেই কঠিন মনে হচ্ছিল। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে, প্রণবদার চিফ ইলেকশন এজেন্টকে সামান্য একটা অজুহাতে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের কোনও একটি থানায় ওখানকার ডিএসপি তুষার ভট্টাচার্য আটকে রেখেছেন, শুনে প্রণবদা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে থানায় গিয়ে তুষার ভট্টাচার্যকে বলেন, 'এখনও সময় আছে, আমার এজেন্টকে ছেড়ে দিন। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ইন্দিরাজি ক্ষমতায় আসছেনই, আর আমি হারলেও মন্ত্রী, জিতলেও মন্ত্রী।' যদিও তুষারবাবু নম্রভাবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে ওঁকে পরের দিন বেল দেবার পরামর্শ দিয়েই প্রণবদাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে গেলেন, এবং প্রণবদাও পরে তা-ই মানতে বাধ্য হয়ে চলে এলেন। কিন্তু ঘটনাটা জানালাম এই জন্য যে, কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে একজন বলতে পারেন, যে উনি মন্ত্রী হচ্ছেনই। এবং হলেনও। দেশের অর্থ মন্ত্রী। পরে গুজরাত থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন।

(ক্রমশ)

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

শুরু হল চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। তবে এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

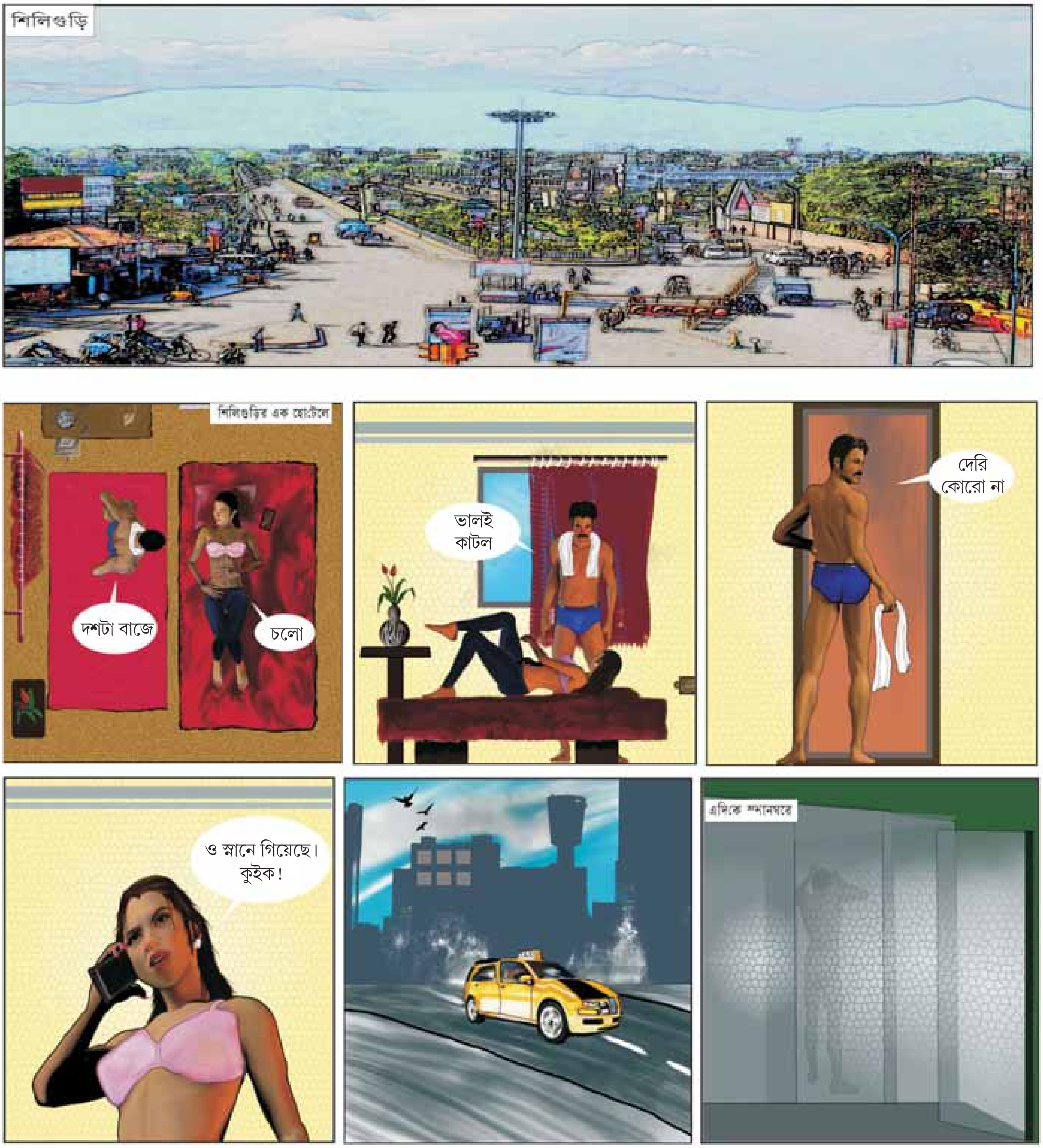

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

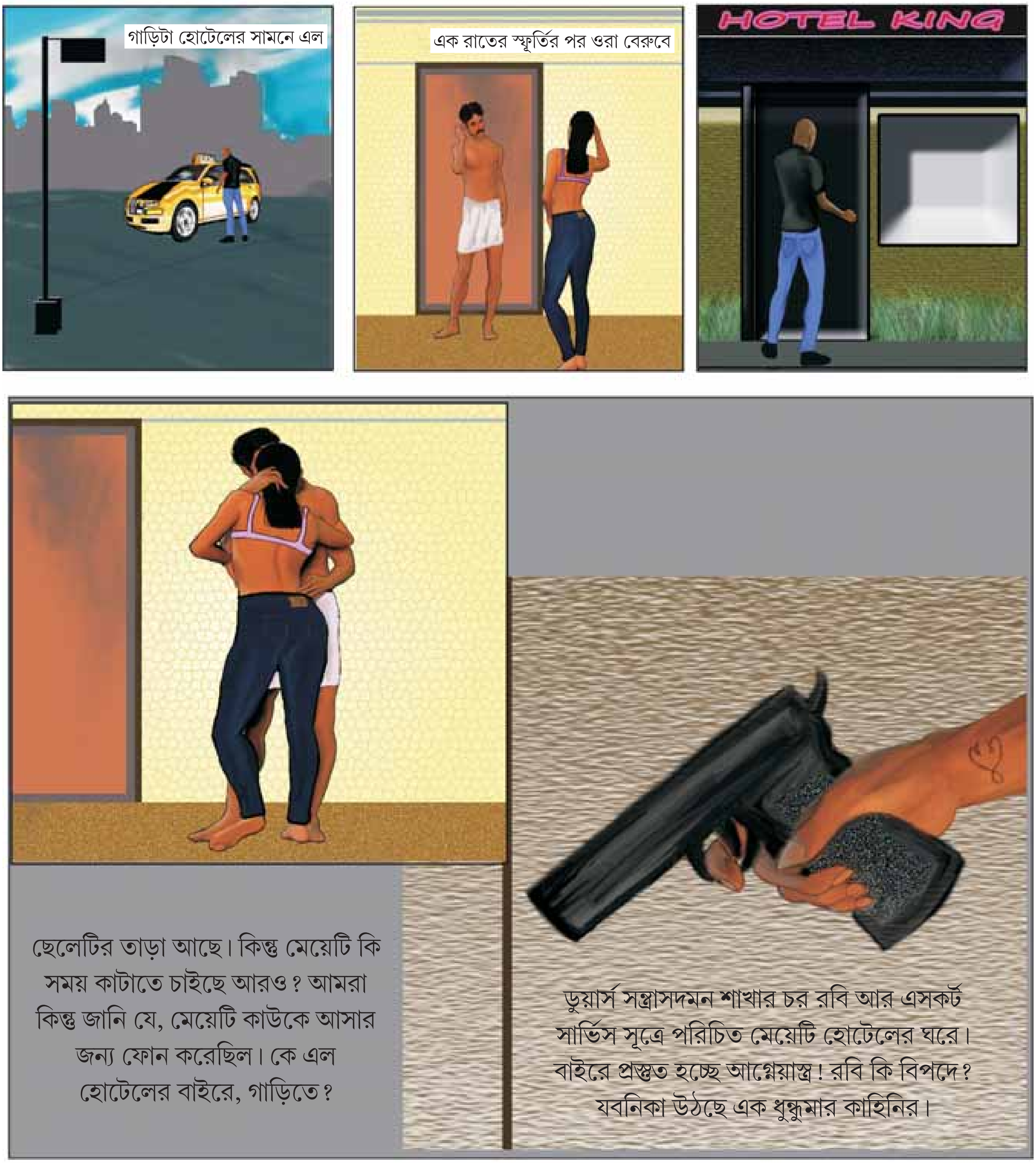

তরাই উৎরাই

৩৮

চারু সান্যাল আর খগেন দাশগুপ্ত দু'জনেই আবার জেলে। সঙ্গে লক্ষ্মণ মৌলিক, অনিল বাগচি, বীরেন চৌধুরী, স্বপ্রকাশ দত্ত থেকে শুরু করে কে না গ্রেপ্তার হয়েছেন। রবি শিকদার স্টেশনের কাছে গোপনে সাইক্লোস্টাইল মেশিনে কংগ্রেসের কিছু কাগজপত্র ছাপতে গিয়েছিলেন একদিন। পুলিশ তাঁকেও ধরেছে। কেবল মহিলা কংগ্রেসের কয়েকজন ছাড়া টাউনে তেমন কেউ নেই যে আন্দোলন টেনে নিয়ে যাবে। এর মধ্যে বর্ষা নেমে গিয়েছে। আকাশ এখন কালো। করলার জল আরেকটু বাড়লেই টাউনে ঢুকে যাবে। তিস্তাও প্রায় ভরো ভরো। গতকাল রাতেই নাকি শ্মশানের একটা পাশ ডুবে গিয়েছে। টাউনের নালাগুলো সব ভরতি। কামারপাড়া থেকে যে বড় নালাটা পাটগোলার পাশ দিয়ে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে রেল গুমটির দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে ডানপিটে ছেলের দল সাঁতার কাটতে শুরু করে দিয়েছে। তিস্তা-করলার ঘাটগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে বড় বড় নৌকো।

ছোট এই টাউনে অনেকগুলো স্কুল। তবুও আরও একখানা স্কুলের জন্য গোপাল ঘোষকে সবাই অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। তবে সমস্যা হল, মনের মতো জমি পাচ্ছেন না তিনি। কদমতলায় হিদারুর বাড়ির কাছাকাছি দেড় বিঘের মতো জমি একজন দান করার জন্য রাজি হলেও গোপাল ঘোষের সে জমি না-পসন্দ। জায়গাটা স্কুলের জন্য চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু দেড় বিঘেতে কি স্কুল হয়? দশ-বারো বিঘে জুড়ে যদি খেলার মাঠই না থাকল, তবে ছেলেপুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে কী করে? বিঘে পনেরো জমিও যে তিনি পাননি তা নয়। তেমন জমিও প্রায় বিনি পয়সায় দিতে রাজি একজন। কিন্তু সে জমি মাষকলাইবাড়িতে, শ্মশানের কাছে, এবং স্কুলের কাছে শ্মশান ব্যাপারটা গোপাল ঘোষ শোনামাত্র উড়িয়ে দিয়েছেন।

আসলে গোপাল ঘোষ মনে মনে চাইছিলেন যে, তাঁর স্কুল হবে জেলা স্কুলের মতো। এর জন্য খরচ করতে তিনি পিছপা নন। তিস্তা নদীর পাড়ে থাকা জেলা স্কুলের চারদিকে অনেক খ্যাতি। যে-সে ছাত্ররা পড়ে না এই স্কুলে। অবশ্য তিস্তা নদীর পাড়ে জমি পাওয়াটা সমস্যা না হলেও সে জমি ঘন জঙ্গলে ঘেরা। প্রায়ই বাঘ চলে আসে। রায়কত রাজাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে জঙ্গল সাফ করে স্কুল বানাতে কয়েক বছর লেগে যাবে। ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে যেতে পারে। গোপাল ঘোষ তাই দেরি করতে চাইছেন না।

হিদারু এখন গোপাল ঘোষের স্কুল নির্মাণ পরিকল্পনার সচিব। এর জন্য গোপাল ঘোষ তাঁকে

পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবেন। সচিব হিসেবে হিদারুর কাজ আপাতত গোপাল ঘোষের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জমি দেখে বেড়ানো। বর্ষা নামার পর অবশ্য কাজটা আর বিশেষ এগচ্ছে না। টাউনের অধিকাংশ ফাঁকা জায়গাই এখন হয় পুরো অথবা আধা জলে ডুবে আছে। আজ সকালেও ভাল বৃষ্টি হয়েছে। স্কুলগুলোতে ঘোষণা করা হয়েছে 'রেনি ডে'। গতকাল গোপাল ঘোষ জানিয়েছিলেন যে, স্টেশনের দক্ষিণে রেললাইন বরাবর একটা জমি দেখতে যাবেন আজ। বাদলের ধারাপাত থামতে হিদারু তাই ছাতা বগলে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। রেললাইন ধরে গেলে তাড়াতাড়ি জমিটার কাছে যাওয়া যাবে আন্দাজ করে হিদারু গুমটির দিকে এগচ্ছিল। লাইন বেয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় একটা দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে গেল সে।

কয়েকটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে পাটকাঠির ডগায় কংগ্রেসের পতাকা লাগিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রেললাইনের ধার ঘেঁষে। একটু দূরে রাস্তার ওপাশে দুটো হাফ প্যান্ট পরা পুলিশ নজর রাখছে তাদের উপর। পুলিশের নজর রাখার ব্যাপারটা ভাল লাগল না হিদারুর। টাউনে বড়দের দেখাদেখি বাচ্চা ছেলেদের 'কংগ্রেস কংগ্রেস' খেলাটা নতুন কিছু নয়। নতুন হল পুলিশের নজর রাখা। এতদিন বাচ্চাদের ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি, কিন্তু এবারের আন্দোলনের পর ইংরেজ সরকার কঠিন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। দিনকয়েক আগেই কয়েকজন স্কুলের ছাত্রের মুখে 'বন্দে মাতরম্' শুনে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গিয়েছিল হিন্দুস্থানি পুলিশ। স্কুলের হেডমাস্টারকে সাবধান করে দিয়েছিল ইন্সপেক্টরের আপিস। হিদারুর মনে হল, ছেলেগুলোকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।

কিন্তু ছেলেগুলোর কাছাকাছি যেতে পারল না হিদারু। তার আগেই পুলিশ দুটো হঠাৎ দৌড়ে চলে এল রাস্তার এ পাড়ে। কিছু বোঝার আগেই ওদের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'শুয়ার কা বচ্চা!' তারপর দড়াম করে লাঠি বসিয়ে দিল একজনের পায়ে। ছেলেটা ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনওমতে উঠে দাঁড়াতেই আরেকটা লাঠির বাড়ি খেল পিঠে।

শান্ত মানুষরা অনেক উত্তেজনায় শান্ত থাকলেও কখন যে রেগে যায় তা বলা মুশকিল। হিদারুর ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই ঘটে গেল সেই মুহূর্তে। আহত ছেলেটার গায়ে তিন নম্বর আঘাতটা পড়ার আগেই সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'সাবধান!' সেই চিৎকারে এতটাই জোর ছিল যে, হাবিলদার দুটো থমকে গেল তক্ষুনি।

'ওদের মারছ কেন?' চোখ লাল করে গর্জে উঠল হিদারু। ততক্ষণে হাবিলদার দুটো চমক কাটিয়ে উঠেছে। তাদের একজন বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে বলে উঠল, 'মার শালেকো!'

ছেলেগুলোকে ছেড়ে ওরা দু'জন রেললাইনের দিকে তেড়ে এল হিদারুকে ধরার জন্য। হিদারু পালাতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তার মাথায় তখন আগুন ধরে গিয়েছে। চোখের পলকে দু'-তিনটে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারল সে। তারপর কয়েক লাফে ওদের মুখোমুখি এসে একজনের মুখে দুম করে বসিয়ে দিল একটা ঘুসি। পাথরের আঘাতে একজন ঘায়েল হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে হাউ হাউ করে চেঁচাচ্ছিল সেই মুহূর্তে। হিদারুর মোক্ষম ঘুসি চিৎপাত করে দিল দ্বিতীয়জনকে। চারপাশে ততক্ষণে হইচই পড়ে গিয়েছে। ঘুসি মারার

হিদারু পালাতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তার মাথায় তখন আগুন ধরে গিয়েছে। চোখের পলকে দু'-তিনটে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারল সে। তারপর কয়েক লাফে ওদের মুখোমুখি এসে একজনের মুখে দুম করে বসিয়ে দিল একটা ঘুসি।

পর হিদারু আবার ফিরে এল নিজের মধ্যে। চকিতে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাণপণে দৌড়াল এবার।

টাউনে মিছিল-মিটিং-আন্দোলন অনেক হলেও পুলিশ পেটানোর ঘটনা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। সেদিক থেকে বিচার করলে হিদারুর অপরাধ খুবই সাংঘাতিক। ছোট শহরে হিদারুকে শনাক্ত করতে বেশি সময় লাগবে না পুলিশের। ঝড়ের গতিতে দৌড়াতে দৌড়াতে হিদারু অনুমান করে নিল যে, ঝোঁকের মাথায় সে একটা গোলমেলে কাণ্ড করে ফেলেছে। এবার তাকে বাঁচতে হবে। বাড়িতে ফেরার এখন আর কোনও প্রশ্নই নেই। সে ঠিক করে ফেলল যে, আগে খুদিদার সঙ্গে দেখা করবে। আদালত থেকে অনেক সময় তিনি আগেই বাড়ি ফিরে আসেন। আজ যা আবহাওয়ার অবস্থা, তাতে বাড়ি চলে আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি ভেবে হিদারু খুদিদার বাড়ির রাস্তাটাই ধরল। তাঁকে না পেলে সেখানেই অপেক্ষা করবে। ব্রিটিশরা আইনকে সম্মান করতে জানে। উকিলের বাড়িতে আসার আগে ছ'বার ভাববে।

কিন্তু হিদারুর ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। বাড়িতেই ছিলেন খুদিদা। বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হিদারু তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল বিধ্বস্ত চেহারায়। সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম বইছিল তার। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিল। উত্তেজনা আর ক্লান্তির যুগলবন্দিতে ঠিকমতো কথা বলতে পারছিল না সে। সেই চেহারা খুদিদাকে বেশ অবাক করল। কিন্তু সংক্ষেপে হিদারু তার বক্তব্য জানাতেই তিনি থম মেরে গেলেন। প্রায় মিনিটখানেক ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকার পর আচমকা লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'বেশ করেছিস! শালাগুলো পেয়েছে কী? কিন্তু ধরতে পারলে তোকে পিটিয়ে আধমরা করে হাত-পা বেঁধে লাটাগুড়ির জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে।'

'আমি টাউনে থাকব না দাদা!'

'তুই দুটো দিন আমার বাড়িতে থাক। পিছনে মালির ঘরটায় কেউ থাকে না। তারপর তোকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি।' খুদিদা প্রবল আত্মবিশ্বাসের গলায় বললেন।

'বাড়িতে খুঁজতে যাবে। না পেলে ওদের উপর অত্যাচার করবে না তো?' হিদারুর গলায় উদ্‌বেগ ঝরে পড়ে, 'আসলে ছেলেগুলোর বয়স আমার বড়টার মতো। মাথাটা হঠাৎ এমন গরম হয়ে গেল না দাদা! ঘুসিটা দারুণ লেগেছে। দাঁত ভেঙে গিয়েছে বোধহয়।'

'বাড়িতে তল্লাশির বেশি কিছু করবে না। কিন্তু তোমায় পেলে অনেক কিছু ভেঙে দেবে।' পায়চারি করতে করতে বললেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড কিছু ভাবলেন। তারপর নরম স্বরে হিদারুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'পরিবার নিয়ে ভাবতে হবে না হিদারু। টাউনের কম লোক তো জেলে নেই। তার চে' বেশি লোক পালিয়ে আছেন। তাঁদের পরিবারগুলি চলছে কেমন করে? মানুষ পাশে থাকলে সব হয়।'

হিদারু আবার উত্তেজনা অনুভব করল খুদিদার কথাগুলো শুনে। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমি সব বলে দিচ্ছি বাড়িতে। তুমি তো এখন আমাদের বাড়িরই লোক। খাওদাও, বিশ্রাম করো। আমি একটু গোপালের সঙ্গে দেখা করে আসছি।' কথা শেষ করে বউয়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে গেলেন খুদিদা। নিস্তরঙ্গ জীবনে অকস্মাৎ অ্যাডভেঞ্চারের বাতাস এসে ধাক্কা দেওয়ায় হিদারুর প্রতিটি তন্ত্রীতে তখন ছড়িয়ে পড়ছিল ছোট ছোট রক্ত-বিস্ফোরণ।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

অরণ্য মিত্র

৬৭

দাসবাবু অবাক! এ কী বলছে রঞ্জিত? তাঁরা আর তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী— এই দুইয়ের মাঝে কি কোনও ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন তিনি? জলপাইগুড়িতে টাকার সন্ধানে আসা রতন বিশ্বকর্মা বেশ টের পেল যে, তাকে শিলিগুড়ি থেকেই ফলো করা হচ্ছে। এবার সে কী করল? ক্যাভেন্ডিসের শাগরেদকে শরীরের ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরি হয়েছে মুনমুন টোপ্পো। সেই কাজে সে কতটা এগতে পারল এবার? বস্তুত, কাহিনি এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেন। আরও বিস্ফোরক কাণ্ডকারখানার প্রস্তুতি নিচ্ছে চুপচাপ। গোপনে তৈরি হচ্ছে বন্দুক, বিস্ফোরণ, টাকা আর নারী। চলুন, পড়ি।

দাসবাবু বেশ অবাক হয়েছেন ফোনটা পেয়ে। পল অধিকারীর সঙ্গে ডিলটা সেরে ফেলার পর খানিকটা স্বস্তিতে ছিলেন। বুদ্ধ ব্যানার্জির প্ল্যান অনুযায়ী ডুয়ার্সে কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটানো জরুরি। অন্তত গোটা দুই বোমা ফাটাতে পারলেই কাজ হবে। পল অধিকারীর লোকের কাছ থেকে যা জানা গিয়েছে, তাতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল পাওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী ডুয়ার্সে থাকাকালীন বিস্ফোরণ ঘটলে তার মতো ভাল আর কিছুই হবে না। তবে সেই ব্যাপারে পল অধিকারীর লোকেরা কোনও নিশ্চয়তা দেয়নি। এখানে অবশ্য পল অধিকারীর ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। পুলিশের খাতায় সে জীবিত নয়। এটা যে তার একটা বিরাট সুবিধা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অন্য দিকে, সে অনেকদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। একদা ভুটান থেকে যে ব্যাকআপ সে পেত, সেটা এখন আর নেই। সঙ্গীরা লাল চন্দন পাচারের কাজে লিপ্ত থাকলেও নেতার সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ না থাকার কারণে কতটা সক্রিয় রয়েছে, সেটাও ভাবার বিষয়।

ফোনটা করেছিল রঞ্জিত। দাসবাবু তার ফোন আশা করেননি, কারণ বুদ্ধ ব্যানার্জির নির্দেশমতো ডুয়ার্সে দিল্লি হাই-এর কাজকর্ম পুরোটাই সামলানোর দায়িত্ব সে পেয়েছে। তার সঙ্গে রঞ্জিতের যোগাযোগ হওয়ার কোনও কারণ নেই। বস্তুত সে কী করছে, সে নিয়ে কোনও মাথাব্যথাও ছিল না দাসবাবুর। তাই কাল সন্ধে নাগাদ রঞ্জিতের ফোন পেয়ে বেশ অবাক লেগেছিল দাসবাবুর। রঞ্জিত দেখা করতে চেয়েছে। দাসবাবু কোথায় আছে, সে তা জানত না। পল অধিকারীর সঙ্গে ডিল সারার পর দাসবাবু দু'দিনের জন্য কালিম্পং এসেছিলেন রিল্যাক্সড হওয়ার জন্য। রঞ্জিত দেখা করার প্রস্তাব দিতে তিনি তখনই ঠিক করেছিলেন যে তাঁকে দার্জিলিং আসতে বলবেন। কিন্তু সে পাহাড়ে আসতে রাজি হয়নি। ফলে দাসবাবু আজ শিলিগুড়ি নামবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বাধ্য নন। কিন্তু ব্যাপারটা যে জরুরি, সেটা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। নয়ত তাঁকে ফোন করত না রঞ্জিত।

বেলা দেড়টা নাগাদ সেবক পেরিয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকলেন দাসবাবু। আসার পথে গোটা রাস্তাটাই চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। বুদ্ধ ব্যানার্জির নির্দেশে বিশেষ মিশনে নামার পর ডুয়ার্সে তাঁর দলের বেশ কিছু ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। পর্ন ভিডিয়ো তোলার কাজ পুরো বন্ধ। নবীন রাইয়ের উপর দু'-দু'বার হামলার ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। দ্বিতীয়বারের হামলাটা বেশ বিস্ময়ের, কারণ নবীন রাই তখন গোপন ডেরায় লুকিয়ে ছিল। ডুয়ার্স আর নর্থ ইস্টে নবীন রাই বেশ পরিচিত নাম অন্ধকার জগতে। তাকে এলেবেলে ভাবলে ভুল হবে। তার গোপন ডেরার খবর ফাঁস হয়ে যাওয়াটা দলের পক্ষে অস্বস্তিকর। বুদ্ধ ব্যানার্জি এই ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছেন, সেটা অবশ্য দাসবাবু জানেন না।

কালিম্পঙের মনোরম পরিবেশ শিলিগুড়িতে এসে হারিয়ে গেল। দাসবাবুর একটু গরম

লাগতে শুরু করল। আকাশবাণী ভবনের কাছে রঞ্জিত থাকবে বলে জানিয়েছে। সেবকের পর জ্যামজট কাটিয়ে দাসবাবুর ভাড়া করা গাড়ি যখন সেখানে এল, তখন দুটো বেজে গিয়েছে। কর্মব্যস্ত শিলিগুড়ি নিজের খেয়ালে ছুটে চলেছে। ড্রাইভারকে কিছুটা এগিয়ে যেতে বলে দাসবাবু আকাশবাণী ভবনের গেটের সামনে দাঁড়ালেন। রঞ্জিতকে দেখলে তাঁর চিনতে পারারই কথা। অবশ্য পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য গুপ্ত কোড আছে।

পনেরো মিনিট পর যে লোকটা একটা অটো থেকে নেমে ধীরপায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল, দাসবাবু অনুমানে বুঝলেন সে-ই রঞ্জিত। অনুমানটা নিশ্চিত করে লোকটা গুপ্ত কোড উচ্চারণ করল। তারপর দাসবাবুর সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, 'ফলো মি।' দাসবাবু নীরবে হাঁটতে শুরু করলেন রঞ্জিতের পিছনে। হাঁটতে হাঁটতে গতি বাড়িয়ে একসময় রঞ্জিতের পাশে চলে আসতে হবে। অপরাধজগতের এটা একটা পুরনো কৌশল। পুলিশের টিকটিকিরাও এই কৌশল অবলম্বন করে।

কয়েক মিনিট হাঁটার পর দাসবাবু গতি বাড়িয়ে রঞ্জিতের পাশাপাশি আসতেই সে বলল, 'যদিও আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনও অধিকার আমার নেই, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। আমি আপনার অ্যাডভাইস চাই।'

'অ্যাডভাইস?' দাসবাবু বিস্মিত হলেন। 'আপনি সবরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। প্রবলেম হলে কলকাতায় বুদ্ধ ব্যানার্জিকে জানাবেন। অ্যাডভাইস তো সেখান থেকেই পাওয়ার কথা আপনার!'

'আই নো। বাট প্রবলেম ইজ ডিফরেন্ট।' জবাব দিলেন রঞ্জিত, 'আমি লিটল কনফিউজড। আপনি কি জানেন যে আমি ভেরি রিসেন্ট চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলাম? কিছু ইম্পর্ট্যান্ট খবর নেওয়ার ছিল সেখানে। কিন্তু আমি সেখানে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে কাজ করতে দেখেছি। তিনি জানতেন আমি চেরাপুঞ্জি যাব। হাফলঙেও যাওয়ার কথা ছিল আমার। সেটাও জানতেন তিনি। কিন্তু ডেট জানতেন না। ইন ফ্যাক্ট, আমি প্রোগ্রাম আচানক সেট করেছিলাম। কিন্তু গৌহাটি গিয়ে আমি ওঁকে দেখি। তিনি আমাকে নোটিশ করেননি। বাট আমি করেছি।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন?' দাসবাবু অবাক হলেন। বুদ্ধ ব্যানার্জি কবে কোথায় যাবেন, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার। এতে রঞ্জিতের সমস্যা হবে কেন?

'দেখুন, নবীন রাইকে তাঁর গোপন ডেরায় যেভাবে এটা করা হয়েছে, সেটা প্রায় আনবিলিভেবল। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ভিতর থেকে ইনফো পাচার করা হচ্ছে।' রঞ্জিত কিঞ্চিৎ উত্তেজিত সুরে বলে, 'সরি টু সে দাসবাবু, আমি খবর নিয়েছি যে, ব্যানার্জি হাফলং এরিয়ায় পেংচংকে মিট করেছেন।'

পেংচং টিমো এককালে ডুয়ার্সে মেয়ে পাচার করত। নামটা ছদ্ম। দিল্লি হাই আসার পর থেকে পেংচং টিমো এদিক থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। তবে নর্থ-ইস্টে দাপট আছে তার। দাসবাবুর মতে, পেংচং টিমো হল পয়লা নম্বরের শত্রু। এর সঙ্গে বুদ্ধ ব্যানার্জির সাক্ষাতের খবরটা জেনে অবাক হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা ছিল না দাসবাবুর।

'আপনি শিয়োর?' তবুও প্রশ্নটা করলেন তিনি।

'আমি জানি আপনি অবাক হচ্ছেন। কিন্তু ইট ইজ ফ্যাক্ট।'

'দেন হোয়াট ইউ লাইক টু সে?'

'বলতে খারাপ লাগছে। লেকিন আমার গোলমাল লাগছে। আই ডাউট ব্যানার্জি। বুঝে দেখুন আপনি— নবীন রাই কোথায় লুকিয়ে ছিল, সেটা আমি ওনলি ব্যানার্জিকে রিপোর্ট করেছিলাম।'

দাসবাবু স্তব্ধ হয়ে হাঁটতে লাগলেন।

'হোয়াই ডিড হি কিল বিজু প্রসাদ?' পুনরায় প্রশ্ন তুলল রঞ্জিত, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, বিজু প্রসাদ চলে যাওয়াতে আমাদের মেয়ে সাপ্লাই লাইনটা চোট খেয়ে গিয়েছে! আপনার কি মনে হয়, যে বিজু প্রসাদ ভুল স্টেপ নিতে যাচ্ছিল?'

'আপনি কি বুদ্ধ ব্যানার্জিকে সন্দেহ করছেন?' দাসবাবু একটু রুক্ষ স্বরে বললেন।

'না করতে পারলে ভালই হত দাদা!' রঞ্জিত দাঁড়িয়ে পড়ে, 'লেকিন আর কোনও ক্লু মিলছে না। যে লেবেলের সিক্রেট ওরা জেনে যাচ্ছে, সেটা আমাদের সিস্টেম হ্যাক করে জানা অসম্ভব। আমি আপনাকে রেসপেক্ট করি। আমি একটা রিকোয়েস্ট রাখব আপনার কাছে।'

'সেটা কী?'

'আপনি অফ হয়ে যান। আমিও অফ থাকি। ধরে নিচ্ছি ব্যানার্জি ফেয়ার আছেন— লেকিন এইসব তাহলে কে ফাঁস করছে?'

দাসবাবু কোনও জবাব দিলেন না। দু'জনেই নীরবে হাঁটতে লাগলেন জনবহুল সেবক রোড ধরে। চুপচাপ হাঁটলেও দাসবাবু কিন্তু ভেবে যাচ্ছিলেন বিজু প্রসাদের কথা। বুদ্ধ ব্যানার্জি তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন না?

'অফ হয়ে যাওয়ার কথা বলছ, কিন্তু দল এটা মানবে কীভাবে?'

'আমরা সুতোর উপর দিয়ে হাঁটি দাদা! যে কোনও সময়ে আমাদের যে কেউ ডেড হয়ে যেতে পারে। দল ডাবল গেম খেলছে কি না, সেটা না জানলে চলে কীভাবে দাদা?' ধীর গলায় বলল রঞ্জিত। তারপর থেমে গিয়ে দাসবাবুর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'আমি আপনার হেল্প চাইছি দাদা! এটা আমাদের জানতেই হবে যে, ইনফর্মেশন কীভাবে লিক হচ্ছে!'

'তবে হাফলং চলো।'

কয়েক সেকেন্ড ভেবে জানালেন দাসবাবু।

৬৮

রতন বিশ্বকর্মা বুঝতে পারছে যে, দুটো লোক তাকে সেই শিলিগুড়ি থেকে ফলো করছে। এনজেপি থেকে হলদিবাড়ি লোকাল ধরে সে জলপাইগুড়ি আসতে চেয়েছিল। নবীন রাই এখন নেপালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু রতনের পক্ষে নেপাল যাওয়া অসম্ভব। গতকাল নবীন রাই ফোন করে জানিয়েছেন যে, জলপাইগুড়ির একটি হোটেলে কাঠমান্ডু থেকে আসা তাঁর এক পরিচিত এসে উঠেছে। সেই লোকের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে। বস্তুত টাকার অভাবে রতন তার প্ল্যান গোছাতে পারছে না। হলদিবাড়িতে সিরাজুলের সঙ্গে দেখা করার পর তার মনে হয়েছিল যে পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো। এই অবস্থায় দরকার কিছু খবর, যা টাকা খরচ না করলে পাওয়া অসম্ভব। অন্ধকার জগতেও কিছু লোকজন থাকে, যাদের কাজ টাকার বিনিময়ে খবর বেচা। নবীন রাই শিলিগুড়িতে থাকলে টাকা পাওয়ার সমস্যা হত না। কিন্তু নেপাল থেকে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে শিলিগুড়িতে নগদ টাকা পাঠানো এই মুহূর্তে বেশ চাপের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলপাইগুড়িতে যে এসেছে, তার কাছ থেকে কত পাওয়া যাবে, সেটা জানে না রতন।

এনজেপি স্টেশনে অটো থেকে নামার পর রতন প্রথম টের পায় যে, তাকে ফলো করা হচ্ছে। প্রধান নগর থেকে বাসে ওঠার সময় লোক দুটোকে সে দেখেছিল ঠিক পিছনের সিটে। তখন অবশ্য সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু সেবক মোড়ের কাছে বাস থেকে নেমে সে যখন অটো ধরতে যাচ্ছে, তখন সে খেয়াল করছিল যে, লোক দুটো তার দিকে তাকিয়ে ছিল। রতন ওদের দিকে তাকাতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ওরা। এর পর এনজেপি-তে হলদিবাড়ি লোকাল ধরার জন্য নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মে ওদের দেখার পর রতন নিশ্চিত হয় যে, লোক দুটোর বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে। ফলো করছে কি না, সে বিষয়ে একশো ভাগ নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে জলপাইগুড়ির

আগের স্টেশন মোহিতনগরে নেমে পড়ে। লোক দুটোকে সেই স্টেশনে নামতে দেখার পর আর কোনও সন্দেহ রাখেনি সে।

রতন বিশ্বকর্মা ঠান্ডা মাথার লোক। মোহিতনগর স্টেশন থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় এসে বাস স্টপের সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সিগারেট খেল। জলপাইগুড়ির দিকে যাওয়া পরপর তিনটে বাস ছেড়ে দিল ইচ্ছে করেই। লোক দুটো কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কের মতো এদিক-ওদিক দেখছিল। চার নম্বর বাসটা স্টপে দাঁড়ানোর পরেও রতন নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ দেখাল না। শেষে বাসটা ছাড়তেই সে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল পাদানিতে। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি সে ঘটিয়ে ফেলল, যে লোক দুটো সব কিছু বুঝে যখন বাস ধরার জন্য ছুটতে শুরু করল, ততক্ষণে সে বাস গতি বাড়াতে শুরু করেছে।

রতন বেশ মজা পেল লোক দুটোকে ফাঁকি দিতে পেরে। পরের বাস আসতে আসতে অন্তত দশ মিনিট। জলপাইগুড়িতে রতনকে খুঁজে পেতে ওদের ঘাম ছুটে যাবে। সেখানে রতন কী কাজে যাচ্ছে, সেটা লোক দুটো সম্ভবত জানে না। কিন্তু ফলো করার বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে তাকে।

নবীন রাইয়ের লোকের সঙ্গে হোটেলে দেখা করে রতন পেল নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা। এতটা সে আশা করেনি। পুরো টাকাটা নতুন দু'হাজারি নোটে পাওয়ায় নিতেও সমস্যা হবে না। রতন ভেবেছিল হোটেল থেকে বাস স্ট্যান্ড হয়ে শিলিগুড়ির বদলে চলে যাবে সামসিং। কিন্তু টোটোয় চড়ে একটা ট্রাফিকে এসে আটকে থাকতে থাকতে তার চোখে পড়ল যে, লোক দুটো ঠিক কয়েক ফুট আগে অন্য একটা টোটোতে বসে আছে। ঘাড় ঘোরালেই রতনকে দেখতে পেত ওরা।

রতন ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। ট্রাফিক খুলে যাওয়ায় ওদের টোটো এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। রতন এদিক-ওদিক তাকিয়ে খালি টোটো পেয়ে গেল একটা।

'আর কোনও প্যাসেঞ্জার নেবেন না।' টোটোর ড্রাইভারকে বলল সে, 'আমি এই গাড়ি রিজার্ভ করছি। একটা টোটোকে ফলো করতে হবে। সেটা একটু এগিয়ে গিয়েছে।'

ছোকরা চালক রতনের কথায় বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমার গাড়ি একদম নতুন সার!'

মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, কিছুটা ব্যবধান রেখে লোক দুটোর পিছন পিছন চলছে রতন বিশ্বকর্মা। লোক দুটোও সম্ভবত টোটোটা রিজার্ভ করেছে। কারণ আর কোনও যাত্রী তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছিল না সে গাড়ির চালক। প্রায় ঘণ্টাখানেক শহরের এ রাস্তা-সে রাস্তা দিয়ে চলার পর শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডের সামনে যখন ওরা থামল, তখন রতন অনুমান করল যে, তাকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে লোক দুটো। স্ট্যান্ডে এনবিএসটিসি-র একটা বাস যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় ধোঁয়া ছাড়ছিল। দেখা গেল যে লোক দু'টি সেই বাসেই উঠছে। রতন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। এবার তার পালা লোক দুটোকে অনুসরণ করার। কিন্তু একই বাসে সেটা সম্ভব হবে না। পরের বাসে গেলে ওদের খুঁজে না পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

'এই স্ট্যান্ডের কাছে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ছিল না?' রতন জিজ্ঞেস করল টোটোচালককে।

'বাস স্ট্যান্ডের পিছনে চলে যান। পেয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্কিউ।' চালকের হাতে দুটো একশো টাকার নোট ধরিয়ে রতন লোকজনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে স্ট্যান্ডের পিছন দিকটায় চলে এল। বাসকে ফলো করে গাড়ি চালাতে হবে জেনে ভাড়াটে গাড়ির চালক কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করতে রতন একটু হেসে বলল, 'আরে, আমার এক বন্ধুকে সারপ্রাইজ দেব। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে, শিলিগুড়ির কোথায় নামছে সে।'

এর পর ট্যাক্সিচালকের আর কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল না। রতন নিশ্চিত ছিল যে, সেই দু'জন শিলিগুড়িতেই নামবে। কিন্তু তাকে অবাক করে প্রায় মাঝরাস্তায় ফাটাপুকুর নামক একটা স্টপে বাস থামতে লোক দুটো নেমে পড়ল। নামার পর ওদের দেখে রতনের ধারণা হল যে, ওরা কাউকে খুঁজছে। বাসটা যাত্রী নামিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। রতন তার ড্রাইভারকে বলল গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে। লোক দুটোর থেকে কম করে একশো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার গাড়ি। ওরা যদি এদিকে এগিয়ে আসে, তবে রতনকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু ওরা এগিয়ে না এসে রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট হোটেলের সামনে দাঁড়াল। রতন লক্ষ করল যে, হোটেলের ভিতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে আসছে, আর সেই লোক রতনের চেনা।

মোহন রাজ! রতন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মোহন রাজ এখানে কী করছে? আপন মনে উচ্চারণ করল সে। ডুয়ার্সে বন্য প্রাণী পাচারের কাজে মোহন রাজ একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়। সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের কারণে সে চুপচাপ আছে বলেই খবর ছিল রতনের কাছে। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে রতনকে ফলো করে আসা লোক দুটোর সঙ্গে মোহন রাজের কী সম্পর্ক?

হোটেলের অদূরে একটা লাল রঙের পুরনো মারুতি ৮০০ দাঁড়িয়ে ছিল। মোহন রাজ দু'জনকে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠতেই রতন ড্রাইভারকে বলল, 'ওই লাল গাড়িটাকে ফলো করে চলুন।'

'আপনার বন্ধু কি নেমে গিয়েছে সার?' ড্রাইভার সাবধানে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'লাল গাড়িটা তো সার বেলাকোবার দিকে যাচ্ছে!'

'আমরাও যাব।' এগিয়ে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জানাল রতন। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গিয়েছে। মোহন রাজ তাঁকে চেনে। সে সরাসরি নবীন রাইয়ের দলের লোক না হলেও নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে তার অনেক দিনের যোগাযোগ। নেপালে নীল ছবির কাজে মোহন রাজ একসময় অনেক সহযোগিতা করেছে। বিনিময়ে নবীন রাই তাকে জুগিয়েছে চিনা কাস্টমার। কিন্তু এই মুহূর্তে বিপক্ষের লোকের সঙ্গে মোহন রাজকে দেখে আদৌ ভাল লাগছিল না রতন বিশ্বকর্মার। তাহলে কি সে ডার্ক ক্যালকাটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? অবশ্য আগে থেকে এ নিয়ে স্থির কোনও সিদ্ধান্তে আসতে চাইছিল না রতন।

বেলাকোবার দিকে লাল মারুতির পিছনে কিছুটা দূর যাওয়ার পর রতন টের পেল, কাজটা বোকামি হচ্ছে। মারুতিটা চলছিল ঢিমতালে। রতনের গাড়ি যদি এই অবস্থায় ওদের না টপকে পিছুপিছু চলতে থাকে, তবে ফলো করার ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে। সে আর এগবে কি না ভাবতে শুরু করল। তখনই সামনে দাঁড়িয়ে গেল লাল মারুতি। দেখা গেল, তার পিছনের দরজা খুলছে।

'গাড়ি ঘোরান! জলদি!' বিপদের গন্ধ পেল রতন। ড্রাইভার থতমত খেয়ে গাড়ি থামিয়ে ব্যাক গিয়ার দিয়ে একটু পিছিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরানো শুরু করতেই রতনের নজরে এল, দুই অনুসরণকারীর একজন লাল মারুতি থেকে নেমে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

'জলদি জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়িটা প্রায় ঘুরিয়ে ফেলেছে। রতন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এগিয়ে আসা লোকটার হাতে একটা পিস্তল। সে পিছনের সিটে শুয়ে পড়তেই শুনল একটা পটকা ফাটার মত শব্দ। ড্রাইভারের জানলার সঙ্গে লেগে থাকা আয়নার কাচটা চৌচির হয়ে গেল সেই শব্দের সঙ্গে। দ্বিতীয় গুলির শব্দটা যখন রতনের কানে এল, তখন তার গাড়ি চলতে শুরু করেছে আবার। বিপদটা চকিতে অনুমান করে তার গাড়ির ড্রাইভার ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল গুলির আওতা থেকে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফাঁকা রাস্তা থেকে জনবসতির মধ্যে চলে এসে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওরা

কারা সার? ফায়ারিং করছিল কেন? আমার গাড়ির লুকিং গ্লাস উড়ে গিয়েছে সার! মালিককে কী বলব?'

'দাম দিয়ে দেব।' শুয়ে থাকা অবস্থা থেকে উঠে বসে একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল রতন বিশ্বকর্মা।

৬৯

দীপক ছেত্রী টুকিটাকি বাজার করে ফ্ল্যাটে ঢুকল। তার মালিক এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেও মাসে তিন-চার দিনের বেশি থাকবে না বলেছেন। দীপকের দায়িত্ব মালিকের অনুপস্থিতিতে ফ্ল্যাটে পারলে চব্বিশ ঘণ্টা থাকা। এমনিতে অসুবিধে নেই। ফ্ল্যাটে মালিক টিভি লাগিয়ে দিয়েছেন। রান্নার ব্যবস্থাও আছে। দীপক বাজার থেকে আলু-সবজি কেনা ছাড়াও হংকং মার্কেট থেকে ব্লু ফিল্মের পেন ড্রাইভ কিনেছে একটা। মালিকের টিভিতে পেন ড্রাইভ লাগিয়ে ছবি দেখা যায়। পেল্লায় চকচকে স্ক্রিনে সোফায় বসে ব্লু ফিল্ম দেখার মজাটাই আলাদা। তার মালিকের নাম ক্যাভেন্ডিস। তিনি কী করেন, দীপক সেটা জানে না। দুই কামরার এই ফ্ল্যাটটায় মালিক নিজে না থাকলে অনায়াসে চাবি দিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি কেন দীপককে মাইনে দিয়ে রেখেছেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। তবে দীপকের মাইনেটা মন্দ নয়। ফ্ল্যাটের ডাইনিং কাম লিভিং স্পেসটা বিরাট। দীপক সেখানেই সোফায় ঘুমায়। নিজের রান্না নিজেই করে। বাইরের কাউকে এখানে না আনার ব্যাপারে মালিকের কড়া নির্দেশ আছে।

দীপক অবশ্য মাঝে মাঝে মেয়ে নিয়ে আসার কথা ভাবে। শিলিগুড়িতে হাজার টাকা দিলে এক ঘণ্টার জন্য একটা চলনসই নারী শরীর পাওয়া যায়। তার গার্লফ্রেন্ড মাস দুয়েক হল ছেড়ে চলে গিয়েছে। সম্পর্ক থাকাকালীন জায়গার অভাবে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি দীপক। ফ্ল্যাটের ডিউটি থাকতে থাকতে একটা মেয়ে জোটাতে পারলে কাজে দিত। ব্লু ফিল্ম দেখার পর মেয়ে নিয়ে খাই খাই ভাবটা তাকে অস্থির করে তুলছে আজকাল। আজ পেন ড্রাইভে যে ভিডিয়ো চারটে নিয়ে এসেছে, তার প্রথমটা চালিয়ে দিতেই দীপক দেখল, একটা নায়িকার মতো মেয়ে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে চুল ঠিক করছে। তার কোমরে ফিতের মতো আবরণ ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। পাশেই উলঙ্গ নায়ক চিৎ হয়ে সাদা ধবধবে বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছে। মেয়েটার ফিগার দেখলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

মেয়েটা এবার ক্যামেরার দিকে ঘুরল। তার বুক দুটোর দিকে তাকিয়ে দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল দীপকের। সোফার উপর সোজা

দরজার ওপাশে একটা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে। তার বুক আর কোমরের গঠন দীপকের চোখ টেনে নিয়েছে পলকে। গায়ের রং কালো হলেও মুখে-চোখে অসামান্য আবেদনের ছাপ। প্যান্টের উপরে উজ্জ্বল হলুদ রঙের জ্যাকেট। বুকের চেনটা খোলা। নিচে সাদা লো-কাটের টপ। স্তনসন্ধির আভাস অতি স্পষ্ট। মেয়েটার এক হাতে একটা চায়ের কাপ।

হয়ে বসল সে। তখনই তাকে খুব অবাক করে দিয়ে টুং করে বেজে উঠল ফ্ল্যাটের কলিং বেলটা। সাহেব এলে কয়েক ঘণ্টা আগে ফোন করে বলে দেয়। তবে কি সাফাইওয়ালা মাসের টাকা নিতে এসেছে? একটু দ্বিধা নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে এসে দরজার কি-হোলে চোখ রাখে সে। এতে আরও অবাক হয়ে যায় দীপক। একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে বাইরে। ভিডিয়ো থামিয়ে দিয়ে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে সে দরজাটা ফাঁক করে।

'হাই!' দরজার ওপাশে একটা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে। তার বুক আর কোমরের গঠন দীপকের চোখ টেনে নিয়েছে পলকে। গায়ের রং কালো হলেও মুখে-চোখে অসামান্য আবেদনের ছাপ। প্যান্টের উপরে উজ্জ্বল হলুদ রঙের জ্যাকেট। বুকের চেনটা খোলা। নিচে সাদা লো-কাটের টপ। স্তনসন্ধির আভাস অতি স্পষ্ট। মেয়েটার এক হাতে একটা চায়ের কাপ।

'আপনার কাছে একটু শুগার পাওয়া যাবে?' ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'শুগার?'

'চিনি। আসলে আমি নিচের ফ্লোরে থাকি। স্টুডেন্ট। চা বানাতে গিয়ে দেখি চিনি নেই।'

'আসুন আসুন। চিনি আছে।' দীপক দরজা খুলে দিল। চিনির সন্ধানে মেয়েটা কেন তার ফ্ল্যাটে হাজির হল— এই প্রশ্নটা মাথাতেই এল না তার। মেয়েটা ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটের ভিতরে চলে এসেছে। চারদিক একবার তাকিয়ে, ভারী নিতম্বে আন্দোলন জাগিয়ে সোফায় গিয়ে বসল।

'আমার নাম মুন। আপনি এখানে একা থাকেন?'

'বেশির ভাগ দিন একাই থাকি। আমার নাম দীপক।'

'আমিও তা-ই। স্টাডির জন্য থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে খুব বোর লাগে। আমি একটু বসতে পারি?'

'বসুন না! কফি খাবেন?'

'কে বানাবে? আপনি?' মুন হাঁটুর উপর কনুই রেখে ঝুঁকে বসে। তার বুক দুটো আরও প্রকট হয় দীপকের চোখে। কিন্তু মেয়েটা যেন সে ব্যাপারে ভারী উদাসীন। সে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দীপককে যেন সুযোগ করে দিচ্ছে তার দেহসম্পদ খুঁটিয়ে দেখার জন্য।

'আমি ভাল কফি বানাতে জানি।'

'নাইস।' মুন নামের মেয়েটা হাসল, 'আপনার রুমটা তেমন ঠান্ডা নয়। জ্যাকেটটা পরে গরম লাগছে।' বলল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। সাদা টপ ভেদ করে এবার পুরো শরীরটা ফুটে উঠল তার। 'আপনার বন্ধুরা কেউ আসবে নাকি এখন?'

'না না। এখানে আর কেউ আসে না।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল দীপক।

'আমি আসলে কয়েকবার দেখেছি আপনাকে। ইউ আর নাইস গাই!' মুন এবার সরাসরি তাকাল দীপকের চোখের দিকে। তার হাসিতে নিষিদ্ধ প্রশ্রয়। 'তুমি আমার বন্ধু হবে?'

দীপকের মনে হল, সে স্বপ্ন দেখছে। সে কিছু বলতে চেয়ে ব্যর্থ হল। বোকার মতো হেসে ফেলল তার বদলে।

'প্রবলেম হলে বলো, আমি চলে যাচ্ছি।' সোফায় শরীরটা সামান্য এলিয়ে দিয়ে চোখ না সরিয়ে বলল সে মেয়ে, 'তোমার নিশ্চয়ই গার্লফ্রেন্ড আছে?'

'চলে যাবেন কেন?' দীপক এবার নিজেকে ফিরে পায়, 'তোমার বন্ধু হতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'তাহলে বসছ না কেন? সোফায় তো অনেক জায়গা আছে, তা-ই না?'

দীপক এগিয়ে এসে সোফায় বসল। মেয়েটা এখন তার এক ফুট দূরে। দীপক একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল। এখন তার মনে হচ্ছিল যে, চিনি নিতে আসাটা মেয়েটার একটা ছলমাত্র। তার সঙ্গে আলাপ করার জন্যই এসেছে মেয়েটা। মুন নামের মেয়েটা, আসলে যার নামমুন মুন টোপ্পো, সে-ও তখন ভাবছিল যে, দীপক নামের ছেলেটাকে শরীরের ফাঁদে ফেলাটা কেবল সময়ের অপেক্ষামাত্র। এটা আসলে ক্যাভেন্ডিসের ভাড়া করা ফ্ল্যাট। দীপককে বশীভূত করে ক্যাভেন্ডিস সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য বার করে আনতে হবে তাকে। কিন্তু এগতে হবে সাবধানে। দু'দিন আগে মনামিকে কিডন্যাপ

করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা জানার পর সুরেশ কুমার বাড়ি থেকে একা না বাইরে আসার নির্দেশ দিয়েছে মনামিকে। তার বা সুষমার উপরেও হামলা হতে পারে যখন-তখন।

'শিলিগুড়িতে তোমার চেনা কেউ নেই?'

'আমি এখানে নতুন।' দীপকের প্রশ্নের উত্তরে বলল সে, 'তুমি কিন্তু ভালই বাংলা বলো। তুমি কি এই ফ্ল্যাটটা পাহারা দাও?'

'অনেকটা সেইরকমই। যাঁর ফ্ল্যাট, তিনি মাসে দু'-একবার আসেন।'

'আবার কবে আসবেন তিনি?' মুনমুন সংশয়ের চোখে জানতে চাইল, 'আমাকে এখানে দেখলে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না?'

'তখন তোমার ফ্ল্যাটে চলে যাব।' দীপক এবার সহজ গলায় কথা বলল, 'তোমার ফ্ল্যাটে কি কোনও গার্জিয়ান আসে?'

'তুমি এলে কেউ থাকবে না।' মুনমুন বিচিত্র হাসল, 'তোমার মালিক কি ফ্ল্যাটের ব্যবসা করেন?'

'কী করেন ঠিক জানি না। তবে তিনি এলে দু'-একজন দেখা করতে আসে দেখেছি।'

'পুলিশ নয় তো?' মুনমুন কপট ভয়ের সুরে বলে, 'আমার কিন্তু পুলিশে খুব ভয়।'

কপট ভয়ের ছায়া মেয়েটার মুখে ফুটে উঠতে দেখে দীপক সম্মোহিত হয়ে যায়। পুলিশের কথাটা বলতে গিয়ে শরীরে আশ্চর্য হিল্লোল তুলেছিল মেয়েটা। ভারী বুক দুটোয় জেগে উঠেছিল আগুন ধরানো স্পন্দন। দীপকের মাথায় ঢুকে পড়ছিল একটু আগে থামিয়ে দেওয়া নীল ছবির সেই নায়িকার নগ্ন শরীর। নিজের দেহে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ার অনুভূতি টের পাচ্ছিল সে। উলটো দিকে বসে থাকা মুনমুনের অভিজ্ঞ চোখও অনায়াসে বুঝে নিচ্ছিল দীপকের উত্তেজনার আঁচ।

'কাল ইভনিং-এ তোমার মালিক আসছে না নিশ্চয়ই?' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল মুনমুন টোপ্পো। তারপর দীপকের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'কাল অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব তোমার সঙ্গে। আই লাইক ইউ!'

কথাটা শেষ করে দীপকের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, চিনির ব্যাপারটা যেন ভুলে গিয়ে, জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। বিহ্বল দীপকের মাথায় গেঁথে রইল তার ঝুঁকে থাকা ভঙ্গির অলৌকিক ছবি। সুগঠিত স্তনের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছিল সে ওই মুহূর্তে। একটা কালো শরীরে যে এতটা মাদকতা লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা জানা ছিল না তার। পরদিন সন্ধেবেলার জন্য সে তখন থেকেই উন্মুখ হয়ে থাকল।

(ক্রমশ)

পাসিং শো-এ ফুঁ, তিস্তাপাড়ে টুঁ

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

বর্ধমান রাজ কলেজের যখন প্রথম বর্ষের ছাত্র, তখন এক মাসের জন্য নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম কাশী। কাশীর বাঙালিটোলায় সাধুজ্যাঠামশাইয়ের আতিথ্যে এক মাস অজ্ঞাতবাস। আর ক্লাস নাইনে পড়ার সময় দে ছুট জলপাইগুড়ি। বেড়ানোর প্রস্তাবে আমার সহপাঠী এক পায়ে খাড়া। তার একটাই প্রশ্ন ছিল— জলপাইগুড়ি গিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসা না, রাত্রিযাপন। বললাম, বাবা তাহলে খড়মপেটা করবে। বললাম, তিস্তা, করলা দর্শন, দেবী চৌধুরানির কালী মন্দির এবং রাজবাড়িতে ঢোকা এবং সেরকম হলে রাজামশাইয়ের সঙ্গে ভোজন। আসলে রেলে চেপে জলপাইগুড়ি যাওয়া-আসা। দারুণ আনন্দ হবে।

যাত্রা সকালবেলায় টাউন স্টেশন থেকে। আমাদের স্কুল থেকে দু'পা গেলে স্টেশন। আমরা প্রায়শ টিফিনবেলায় কোনও সময় স্কুল ফাঁকি দিয়ে স্টেশন, রেলগাড়ি, পুরনো দিনের লাল রঙের ইটের দোতলা-একতলার আশপাশে ঘুরঘুর করতাম। আমাদের লোভ পেয়ারা-কুল পেড়ে খাওয়া। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঢুকলে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতাম ইঞ্জিন। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চালক, সহকারী বেলচা দিয়ে কয়লা ঢোকাচ্ছে। গার্ড, হুইস্‌ল, ঢংঢং শব্দ, সবুজ পতাকা নাড়া, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভুসভাস শব্দ করতে করতে চোখের আড়াল হয়ে যেত। ব্যাস, তারপর নিঝুম শুনশান। বিমলদা হুইলার বন্ধ করে বাড়ির দিকে।

জলপাইগুড়ি বেড়ানো। মনে মনে কল্পনা, স্বপ্নের জাল বুনে যাওয়া। যা দেখি নাই তা দেখার জন্য চিরকাল আমার মন আঁকুপাঁকু করে। শিলিগুড়িতে তখনও গ্রাম্যতা হারিয়ে যায়নি। সে যা-ই হোক, ঘরে বসে হোমওয়ার্ক আর মা-র কাছ থেকে কিছুটা টাকাকড়ি ম্যানেজ। তারপর চলো যাই। একদিন সত্যি সত্যি দু'জনে রওনা হলাম। ট্রেন আসার অনেক আগে পৌঁছে গোটা স্টেশনে চক্কর, প্ল্যাটফর্মের এ মাথা থেকে ও মাথা।

বললাম, টিকিট কাটবি না?

—দূর, আমরা স্টুডেন্ট। বিন টিকিটে যেতেই পারি।

আমি বললাম, টিটি ধরলে কিন্তু জরিমানাসহ আদায়। হাজতবাসও হতে পারে, বুঝলি।

আমার অনুরোধে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত টিকিট কাটার পর নিশ্চিন্ত হলেও ছটফট করছি কখন ট্রেন ঢুকবে। প্ল্যাটফর্মে ব্যস্ততা, লোকজনের ভিড়, শোরাবজির ক্যান্টিনে লোকজন ঢুকছে-বেরুচ্ছে। ঝুঁকে দেখছি ইঞ্জিনের মাথা দেখা যায় কি না। আমরা বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছি। ট্রেনের হুইস্‌ল শুনে আমরা দু'জনে পুলকিত। সদর্পে ইঞ্জিন আমাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে চলে গেল। ফাঁকা কম্পার্টমেন্ট দেখে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকি। আনন্দে জানালার এদিক-ওদিক করছি। এত ঘিঞ্জি বসতি, দোকানপাট তখন কিছুই ছিল না। যেদিকে তাকাও, দিগন্তব্যাপী সবুজ মাঠ, ঘরবাড়ি, নীলাভ পাহাড়, সুভাষপল্লি, ডাবগ্রাম, স্বচ্ছসলিলা ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি দেখা যেত। ওই যে, ওই তো দেখা যাচ্ছে সুভাষপল্লি জেলখানার পিছনে জ্যাঠামশাইদের বাড়ি। মাঠ ভরে আছে টুসটুসে বনকুল, চুকাই, আকন্দ, ভাঁট, বাঁশঝোপ। তখন এনজেপি-র জন্মই হয়নি। কলকাতা আসা-যাওয়া ছিল কাটিহার, মনিহারি, তারপর গঙ্গা পার হয়ে সগরিগলি

এত ঘিঞ্জি বসতি, দোকানপাট তখন কিছুই ছিল না। যেদিকে তাকাও, দিগন্তব্যাপী সবুজ মাঠ, ঘরবাড়ি, নীলাভ পাহাড়, সুভাষপল্লি, ডাবগ্রাম, স্বচ্ছসলিলা ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি দেখা যেত। ওই যে, ওই তো দেখা যাচ্ছে সুভাষপল্লি জেলখানার পিছনে জ্যাঠামশাইদের বাড়ি। মাঠ ভরে আছে টুসটুসে বনকুল, চুকাই, আকন্দ, ভাঁট, বাঁশঝোপ।

ঘাট। সে ভজঘট বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারস্যাপার। সে প্রসঙ্গ থাক। খাঁচার পাখি যখন ওড়ার আনন্দ পায়, কী মজাই না লাগে। আমাদের ছটফটানি দেখে একজন বয়স্ক মানুষ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তোমরা ওরকম করছ কেন? ঠিকভাবে বোসো। কোন ক্লাসে পড়ো?'

—ক্লাস নাইন।

—কোন স্কুল?

—বয়েজ স্কুল।

—শচীনবাবু স্যার কী পড়ান?

—আমাদের হেড মাস্টারমশাই।

—আমারও স্যার।

আমরা ওঁর মুখের দিকে তাকাই।

—তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

—জলপাইগুড়ি।

—নেমন্তন্ন খেতে?

—না না, বেড়াতে।

—আরে রামো। ছ্যা ছ্যা। ভূমণ্ডলের আর জায়গা খুঁজে পেলে না? জলপাইগুড়ি বেড়ানোর জায়গা!

আমরা দু'জন সুবোধ বালকের মতো যা বলে যাচ্ছেন শুনছি।

আমবাড়ি পার হয়ে বেলাকেবা স্টেশন। চমচমের কথা মনে পড়ল। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর কাছিমের টাল। বিক্রি হয়। কাছিমের পাইকারি আড়ত বোধহয়। মোহিতনগর ছুঁয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাতে আমাদের আনন্দ দেখে কে? স্টেশন থেকে বেরিয়ে দু'জনে যেন হাবাগোবা। কোন দিকে যাব। কদমতলার নাম শুনেছি। এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করাতে বলল, তোমরা যাবাটা কোথায়?

—তিস্তা নদী দেখব।

—তাহলে কদমতলা কদমতলা করছ কেন? এই রাস্তা দিয়ে সোজা হাঁটো। দেখবে সম্মুখে তিস্তা।

হাঁটা না ছোটা বলা যায়। তিস্তা গতিপথ অনুসন্ধানে, উৎপত্তি গবেষণা কিছু নয়, শুধু দু'চোখ মেলে তিস্তা দর্শন। ডাকঘর, ফণীন্দ্রদেব স্কুল, ছোট ছোট সুন্দর একতলা, কোথাও দোতলা। বেশির ভাগ কাঠের। বেশ ছিমছাম। এবারে ডান দিকে ঘোরো। বাঁ দিকে রায়কতপাড়া। সবই অচেনা।

জলপাইগুড়ির অভিজাত এলাকায় এসে পড়েছি। প্রাচীনকালের ইটের লাল রঙের দোতলা-একতলা রাস্তা থেকে অনেকখানি মোরাম বাঁধানো পথ। গাছপালা ছায়াময়। জেলাশাসক, পূর্ত, বন দপ্তরের বড়, মেজ, সেজদের সরকারি বাসভবন। বাইরে নেমপ্লেটে লেখা নাম, দপ্তর। তিস্তা উদ্যানের এত অলংকার সৌন্দর্য তখন ছিল কি না মনে নেই। কোনটি হেরিটেজ হাউজ তা-ও জানা নেই। আজও আমার সেভাবে তালিকা মিলিয়ে দেখা হয়নি। যা-ই হোক, বাঁধের উপরে উঠে শীতের ঘুমিয়ে পড়া তিস্তা যেন কুমিরের মতো চোখ বুজে আছে। বালুচর দেখি। তিস্তা সেতু যতদিন ছিল না, কিং সাহেবের ঘাট, ময়ূরপঙ্খি, অযান্ত্রিক, বার্নেশ বাহন সচল ছিল। বাঁধের উপর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ছাতিম গাছের ছায়ায় বসি। বন্ধু পকেট থেকে বার করে পাসিং শো-র প্যাকেট। নে ধরা। আঃ, কী অনির্বচনীয় আনন্দ। ঘাসের উপর লম্বা হই। ছায়া দোলে। পাখি ডাকে। এই যে প্রথম দেখা, তার আনন্দ কীভাবে বোঝাব? আজকের দিন হলে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে পোস্ট হয়ে যেত। বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি। শিশু থেকে বুড়ো সবার গলা, পকেটে স্মার্ট

বাঁধের উপরে উঠে শীতের ঘুমিয়ে পড়া তিস্তা যেন কুমিরের মতো চোখ বুজে আছে। বালুচর দেখি। তিস্তা সেতু যতদিন ছিল না, কিং সাহেবের ঘাট, ময়ূরপঙ্খি, অযান্ত্রিক, বার্নেশ বাহন সচল ছিল। বাঁধের উপর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ছাতিম গাছের ছায়ায় বসি। বন্ধু পকেট থেকে বার করে পাসিং শো-র প্যাকেট। নে ধরা। আঃ, কী অনির্বচনীয় আনন্দ।

ফোন। অনেক হাঁটা হয়েছে, এবারে খাবারের সন্ধান। নিচে নেমে যাকে সামনে পেলাম, জিজ্ঞেস করি— আচ্ছা বলুন তো, ভাল হোটেল, মানে যেখানে শান্তিতে বসে খাওয়া যায়।

—তোমরা থাকো কোথায়?

—শিলিগুড়ি।

—এখানে কোথায় উঠেছ?

—কোথাও না।

—মানে বাড়ি থেকে পালিয়ে? ভাবসাব ভাল মনে হচ্ছে না।

—থাক, আপনাকে বলতে হবে না।

—শোনো শোনো। একটু এগিয়ে গেলে হাতের বাঁ দিকে দেখবে যাযাবর। রান্নাটা ভাল কিন্তু খরচ বেশি। আমার জানা ছিল রুবি বোর্ডিং। মন্দ নয়। হেঁটে গেলে একটু সময়। হাঁপাতে হাঁপাতে রুবিতে হাজির। এখানেও প্রশ্ন।

—কী চাই?

—খাব।

—আমিষ না নিরামিষ?

বললাম, ডাল, ভাত, ভাজা, সবজি, সঙ্গে যদি ইয়ে, মানে ডিমের অমলেট দেন তো ভাল হয়।

বাড়িতে তো রোজ একরকম খাওয়া। এখানে একটু রুচি পরিবর্তন। বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে ভাত, বাটিতে ডাল, তরকারি, ভাজা, পেঁয়াজ, লংকা, লেবু, ডিমের অমলেটও চলে এল। পঞ্চাশ বছর আগে খাবারের দাম কী নিয়েছিল মনে নেই। রুবি বোর্ডিং এখনও আছে। তারাই বলতে পারবে টাকাপয়সা আনার হিসেব। বছর তিনেক আগে শীতের অরণ্য ভবন থেকে বেরিয়ে যাযাবরে ঢুকি। মাফলার পেঁচানো। সম্মুখে লকরির উনান দাউদাউ জ্বলছে। মালিক কি ম্যানেজার জানি না। জিজ্ঞেস করি, রান্নাবান্না হয়েছে।

—মাছটা বাকি। নিরামিষ খান।

ফুলকপির ডালনা, ডাল, ভাজা, লংকা, পেঁয়াজ, লেবু। ভিতরে হাত ধোবার ব্যবস্থা। চকোলেটের মতন টুকরো টুকরো লাইফবয় সাবান। অনেকে নাকি হাত ধুয়ে সাবান পকেটে ভরে নিয়ে চলে যায়। তাই এভাবে টুকরো করে রাখা। ভোজন দক্ষিণা মাত্র আশি টাকা।

বললেন, রান্নাবান্না কেমন?

—অতি উত্তম।

যা-ই হোক, পেট ভরে খেয়ে বিল মিটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কদমতলা। ফিরে যাই আরও পুরনো দিনের স্মৃতিচারণে। রূপশ্রী কি রূপমায়া সিনেমা মনে নেই। দূর থেকে সিনেমার পোস্টার দেখি। তেমন ব্যস্ততা নেই। মিষ্টির দোকান, মনিহারি, ওষুধপত্রের দোকান। ডান দিকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি বাস আড্ডা। শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ত কলাহাটি, থানার উলটো দিকে। ভাড়া মাত্র পাঁচ সিকে। রিকশা নিয়ে পইপই করে ছোট কালীবাড়ি। দু'চক্কর দিয়ে প্রণাম জানিয়ে রাজবাড়ি। গেটে একজন দাঁড়ানো দেখামাত্র— যাও যাও। এখানে কেন? আমার সহযোগী ফচকে স্বভাবের। বলে, রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতাম।

—হবে না, যাও। উনি এখন ঘুমুচ্ছেন।

মনের দুঃখে দিঘির পাড়ে বসি। চমৎকার জায়গা।

—নে ধরা। পাসিং শো-র চারখানা কিনেছিল। শেষ টান দিয়ে উঠে পড়ি। ব্যাস, জলপাইগুড়ি দর্শন শেষ। ট্রেন এল হলদিবাড়ি থেকে। বাঁদরের মতো লাফিয়ে ওঠা। ঝিমুতে ঝিমুতে টাউন স্টেশন। ঘরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। গোয়ালঘরের পিছনে হুক্কাহুয়া রব শুরু হয়ে গিয়েছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির ন্যাফ-এর ‘নেচার স্টাডি ক্যাম্প ফর চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন, ২০১৬’

সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত রোহিত। এসেছে কলকাতার বাঘাযতীন থেকে। হুইলচেয়ারে বসে বসে আকাশ দেখছিল, মেঘ দেখছিল, আর অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলছিল ন্যাফ (HNAF: Himalayan Nature & Adventure Foundation)-এর যে গাইড ওর জন্য আছেন, তার সঙ্গে। এই দূর দেশে এসে এঁরাই তো ওদের আপনজন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

গাইড বললেন, বলে দাও, তোমার নাম বলে দাও।

ও বলল, রো-ও-হিট।

গাইড বললেন, ওঁকে বলো যে, ক্যাম্পে এসে তোমার কেমন লাগছে।

রোহিত হাসিতে লুটোপুটি খেয়ে বলল, ভা-ও লেগেঠে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম ওর পাশে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম ওর মনের ভিতরটা। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে মাথাটা ঘুরিয়ে জড়ানো জিবে মিষ্টি করে বলল, ওটা আমার টেন্ট।

বলেই আবার আপন মনের জগতে ডুবে গেল। আমি তো ওর অন্তরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে চলেছি তখনও। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রোহিত। ওর চোখ হাসছে, ঠোঁট হাসছে, গাল হাসছে। বাঁ হাত বাড়িয়ে টেনে ধরল গাইডকে, ডান হাত উপরে তুলে আঙুল দিয়ে দেখাল—

—মে...ঘ...

গাইড ভদ্রলোক বললেন, মেঘ থেকে কী তৈরি হয় যেন রোহিত?

—বি...ট্টি...

মুহূর্তের মধ্যে আমার গলার কাছে কান্না দলা পাকিয়ে উঠল। গলার স্বর কেঁপে উঠল। আমি সামলে নিলাম। অনুভব করলাম, আমার প্রাণের মধ্যে যেসব মুক্ত সঞ্চয় করেছি এতকাল, তোলপাড় করে খুঁজে দেখলে হয়ত বা দেখব, এমন সুন্দর একটিও সংগ্রহ করতে পারিনি এতদিন। ভাবতেই ভাল লাগছিল, ওর অনুভূতি-আবেগ সব কিছু নিয়ে ও এই প্রকৃতিপাঠের শিবিরে এসে সত্যিই তাহলে কিছু পেল। প্রকৃতির সঙ্গে ওর সখ্যকে নিবিড় করতে পারল। সেই সঙ্গে পাওয়া হল ন্যাফ-এরও। যাদের জন্য এমন একটা ক্যাম্পের আয়োজন, তারা হাসছে, খেলছে, অনেক নতুন নতুন কথা বলছে, যা তারা আগে কখনও বলেনি।

এ বছরের এটি ন্যাফ-এর তরফ থেকে স্পেশালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেনদের জন্য ২৬তম নেচার স্টাডি ক্যাম্প। ঝালঙের পথে যেতে গৈরিবাস থেকে ৫ কিলোমিটার পর দলগাঁওতে ‘ত্রিবেণী ইউনাইটেড ক্লাব’-এর মাঠেই এবারের শীতকালীন ক্যাম্পের টেন্ট পেতেছে ন্যাফ। প্রতি বছর ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে স্পেশালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেনদের জন্য, আর ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই একই পরিকাঠামোয় বসে স্বাভাবিক কিশোর-কিশোরী, যাদের বয়স অবশ্যই পনেরো বছরের মধ্যে, তাদের জন্য।

চ্যালেঞ্জড বাচ্চাদের নিয়ে এই ক্যাম্পাসটিতে যোগদানের জন্য শুধু ডুয়ার্স কিংবা উত্তরবঙ্গ, এমনকি শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকেই নয়, ভারতের নানান সংস্থাও ন্যাফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে। রাজস্থান থেকে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে এইরকম ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ ছোটদের নিয়ে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে একটি দল, যারা এইসব বাচ্চাকে নিয়েই কাজ করে সারা বছর। বলা ভাল, বছরের পর বছর। তেমনি আর-একটি সংস্থা এসেছে বেনারস থেকে। বিভিন্ন সংস্থার তরফ থেকে কয়েকজন করে এসকর্ট আসেন ক্যাম্পারদের সঙ্গে নিয়ে। বেনারসের সংস্থার সঙ্গে দু’জন সুইস মহিলা এসেছেন। সুইটজারল্যান্ড থেকে এরা ভারতবর্ষে কাজ করতে এসেছিল ওই সংস্থার শিশু-কিশোরদের জন্য। সংস্থার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে চলে এসেছেন ন্যাফ-এর এই নেচার স্টাডি ক্যাম্পে। এ বছরের ক্যাম্পার ১২০ জন ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসকর্ট এসেছেন প্রায় ৭২ জন। আরও অনেক অনেক অনুরোধ এসেছিল, কিন্তু সঠিকভাবে পুরোটা পরিচালনা করার জন্য নিজেদের পরিকাঠামো অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অনেক অনুরোধকে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হয়নি। ন্যাফ-এর কর্ণধার অনিমেষ বসু তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা ন্যাফ-এর তকমার উপর একটি আঁচড়ও যাতে না পড়ে, সে বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়। তাই আর ক্যাম্পার বাড়াতে চান না, পাছে তাদের দেখাশোনা ঠিকঠাক না হয়। বারবার বলছেন তাঁর দলের মানুষজনের কথা, ‘ওরা না থাকলে আমি কে? কীসের অর্গানাইজেশন? বিনা স্বার্থে আমাকে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের অনেক বেশি অবদান এই ক্যাম্পের জন্য।’ সত্যিই তাঁদের অবদান দেখার মতো। একটি পরিবার যেন। এত বড় একটি কাজ এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন কীভাবে! কোথাও কোনও খামতি নেই। বিরাট বড় মাঠটিতে সবুজ ঘাসের ফরাশ পাতা, কোথাও একটি কাগজের টুকরোও

পড়ে নেই। অথচ মাঠেই চলছে খেলাধুলো, মাঠে বসেই খাচ্ছে সবাই। মাঠের কোনায় রাখা আছে ‘গারবেজ বক্স’। একটা বড় ড্রাম, তার গায়ে লেখা রয়েছে ‘লস্ট অ্যান্ড ফাইন্ড বক্স’। কারও কিছু হারানো জিনিস অন্য কেউ খুঁজে পেলে এই বাক্সে রেখে দিতে হবে। যার জিনিস হারাল, সে এই বাক্সেই খুঁজবে। অদ্ভুত সব নিয়মনীতি এখানে। তিন গ্লাস জল খেলে নাকি একটা করে চকোলেট। ছোট বাচ্চাদের না বকে না মেরে জল খাওয়ানোর এর চাইতে ভাল উপায় আর কী হতে পারে। চলতে থাকে জল খাওয়ার কম্পিটিশন। মাঝখান থেকে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত অনেকটাই।

ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে অভ্যস্ত পায়ের সমস্যায় আক্রান্ত ক্যাম্পারদের দেখলাম পাথুরে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই কত সুন্দরভাবে ওঠানামা করছে। একজনকে গাইড পিঠে করে নিয়ে গেলেন নির্দিষ্ট জায়গায়, যেখানে স্পাইডার’স নেট আর বার্মা ব্রিজ টাঙানো রয়েছে। অন্যান্যরাও সকলে পৌঁছাল। পিছন পিছন ছানাবড়া চোখ নিয়ে আমি ছুটছি। সামনে ক্রাচ নিয়ে ওরা আর পিছন পিছন আমি। প্রায় ছুটতেই হল পুরো পথটা। যেভাবে ক্রাচকে যত্ন করে সরিয়ে রেখে বেল্ট পরে দড়ির ফাঁকে পা বাঁধিয়ে তরতরিয়ে উঠে যেতে লাগল নেটে, আমি সত্যিই তাজ্জব। কই, কোথাও তো কোনও প্রতিবন্ধকতা নজরে পড়ল না। একজন পারছিল না কিছুতেই। সে অবশ্য মানসিক ভারসাম্যহীনও বটে। ‘পারব না’, ‘পারব না’ বলে চিৎকার করছে মেয়েটি, আর তাকে ঘিরে সবাই মিলে উৎসাহ দিয়ে বলে চলেছে, ‘পারবে, ওঠো, পারবে’, ‘এই তো পারছ’, ‘কে বলেছে পারবে না?’...। ও মা! অবশেষে দেখলাম, অন্তত কুড়ি ফুট উপরে ঝুলছে সে, আর যতটা চেঁচিয়ে বলছিল ‘পারব না’, তার চাইতে বেশি চেঁচিয়ে এখন বলছে, ‘পেরেছি’, ‘পেরেছি’। আর সেই সঙ্গে আনন্দ-আবেগে তুমুল হাসির ঝড় উঠেছে ওর চোখে-মুখে-বুকে। আমি আমার ছানাবড়া চোখকে আরও বিস্ফারিত করে ফেলেছি ততক্ষণে।

একটু দূরে আর-একটি স্পটে গিয়ে দেখলাম, ডিয়ার-এ গ্রুপের গাইড বিরাট কড়াইতে রান্না বসিয়েছে ফ্রায়েড রাইস আর ডিম কষা। এই দলটির ক্যাম্পাররা দৃষ্টিহীন। আজ ওদের ডে আউট। সব গ্রুপেরই একদিন করে ডে আউট থাকে। খানিকটা পিকনিকের মতো ব্যাপারস্যাপার আর কী। আগুনের কাছে যাওয়া ছাড়া বাকি সব কাজে গাইডকে সাহায্য করছে ওরা। শুকনো ডাল জোগাড় করা, সবজি কাটা, ডিম ছোড়া— সব কিছু। ন্যাফ-এর আর-একজন সদস্যের মুখে শুনলাম, ওদের মধ্যে কেউ কেউ খাওয়ার জলের স্টিলের গ্লাস দিয়ে এত সুন্দর করে সবজি কাটতে পারে, যেটা নাকি ওদের কাছেও নতুন। তার মানে সেসব ওরা নিজেদের সংস্থাতেই শিখেছে। দৃষ্টিহীন ক্যাম্পাররা যখন বিকেলে ক্যাম্পে ফিরল, সুষ্ঠুভাবে তৈরি করা একটি লাইনের শুরুতে

গাইড শুধু ডান-বাঁ, উঁচুনিচু ইত্যাদি নির্দেশ দিয়ে চলেছেন, আর তারপর থেকে অন্তত গোটা দশ-বারোজন ক্যাম্পার একে অপরের কাঁধে হাত রেখে সুন্দর ‘কিউ’ রেখে বড় বড় বোল্ডার ফেলা উঁচুনিচু রাস্তা ভেঙে ঠিকঠাক পৌঁছে গেল ক্যাম্পের বাউন্ডারির মধ্যে। সকলের মুখের হাসি দেখে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, এখানে এসে ওরা এমন কিছু পায়, যার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে।

অদ্ভুত সুন্দর ন্যাফ-এর ব্যবস্থাপনা। গোটা বারো-তেরো টেন্ট খাটানো হয়েছে মাঠের ধার দিয়ে। প্রত্যেকটিই ডুয়ার্সের কোনও না কোনও নদীর নামে। যেমন— ডায়না, লিস, ঘিস, চেল, জলঢাকা, তিস্তা, তোর্সা, সুন্তালি-খোলা, আশালি-খোলা, রায়ডাক, মূর্তি— এইসব। এ ছাড়াও আছে এমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেন্ট, অফিস টেন্ট, ওয়াশরুম, No. 1 & 2 পুরুষ ও মহিলা। অর্থাৎ সবটাই বড্ড গোছানো। এবারের ক্যাম্পে রান্নাবান্নার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সেল্ফ-হেল্প গ্রুপের মহিলারা। গ্রামের মানুষরা, ত্রিবেণী ইউনাইটেড ক্লাবের সদস্যরা, সেল্ফ-হেল্প গ্রুপের মহিলারা নিজেরাই তাঁদের বাড়ি থেকে স্কোয়াশ, রাই শাক ইত্যাদি সবজি নিয়ে চলে আসছেন ক্যাম্পে খাওয়ানোর জন্য। এ আন্তরিকতা কি কম বড় পাওয়া! ক্যাম্পারদের গ্রুপে সাজানোর মধ্যেও আছে আবেগের ছোঁয়া। হুইলচেয়ারে বসে যারা, একেবারেই চলচ্ছিক্তিহীন, তাদের গ্রুপের নাম রাখা হয়েছে ‘চিতা’ (দ্রুততম প্রাণী); ক্রাচ নিয়ে চলে যারা, তারা টাইগার; মূক ও বধির যারা, তাদের গ্রুপ হল ‘ময়না’ (মিষ্টি কণ্ঠে কথা বলতে পারে); দৃষ্টিহীনের ডিয়ার গ্রুপ (যেন হরিণের মতো টানা-টানা চোখ)। মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে চাপটা একটু বেশি থাকে সবসময়ই। কখন কোথায় ওয়ান কিংবা টু করে ফেলে, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। কেউ কেউ রয়েছে হাইপারঅ্যাক্টিভ। তাদের মতিগতিও বোঝা যায় না সবসময়। তবে গাইডরা সেসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ তৈরি। এ ধরনের ক্যাম্প করলে এরকম নানান সমস্যা যে আসতেই পারে, সে বিষয়ে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

সাধারণ শিশু-কিশোরদের জন্য যে ক্যাম্প হয় ২৫ ডিসেম্বর থেকে, এই ক্যাম্পের তুলনায় তা অত্যন্ত হালকা মনে হয়, বললেন এক অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বললেন, এতগুলো হুইলচেয়ার, ক্রাচ— সব গাড়িতে নিয়ে আসা, সেই সঙ্গে এই ধরনের এতগুলো বাচ্চা নিয়ে এসে তাদের উপর নজর রাখার দিকটাও দক্ষ হাতে সামলানোর দায়িত্ব— সব মিলিয়ে আমরা অত্যন্ত চাপের মধ্যে থাকি। কিন্তু সব কিছুর পর যখন দেখতে পাই নদীতে স্নান করতে নেমে ওদের মুখে তৃপ্তি আর উচ্ছ্বাসের হাসি, তখন সমস্ত কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। ওরা সারাজীবনে এই আনন্দ তো পেত না এখানে না এলে। এটাই আমাদের তৃপ্তি, এটাই আমাদের ক্যাম্প আয়োজন করার অনুপ্রেরণা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বই পত্রের ডুয়ার্স

তিনটি বই

কিছুদিন আগে সবিতাদেবীর বইটি দপ্তরে আসার পর একবারও মনে হয়নি যে, অনতিবিলম্বে চিরকালের জন্য তিনি চলে যাবেন। ডানপন্থী রাজনীতিতে তিনি ডুয়ার্সে অতিপরিচিত মুখ ছিলেন। শিক্ষকতা করেছিলেন চল্লিশ বছর। এসবের পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন। কয়েক মাস আগে সবিতাদেবীর একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে ‘পরম্পরা’ প্রকাশন ‘নিজস্ব যাপন’ নামের একটি বই প্রকাশ করেছিল। কালিদাসের লেখা শকুন্তলার মতো তাঁর বইটিও ‘পূর্ব মেঘ’ এবং ‘উত্তর মেঘ’ নামে দুই ভাগে বিভক্ত। এই বিভাজনের কারণ অবশ্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। উভয় বিভাগেই নানা রসের কবিতা রয়েছে। তবে দ্বিতীয় ভাগে

আধ্যাত্মিকতার ভূমিকা একটু বেশি বলে মনে হা। অনুমান করি যে, দুই পর্বের রচনায় কালগত পার্থক্য আছে। তাঁর আগের কবিতার বই ‘গান্ধারে পঞ্চম’ বেরিয়েছিল ১৯৮৬-তে।

ব্লার্বে দাবি করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক পরিবেশ বারবার আঘাত করেছে কবিকে। যদিও কবিতাগুলির মধ্যে এমন কোনও স্বাক্ষর নেই। কবিতা লেখার সময় তিনি রাজনীতিবিদ কিংবা শিক্ষক থাকেননি। সংবেদনশীল একজন মানুষ সমাজের অভিশাপ এবং আশীর্বাদ প্রত্যক্ষ করে যা অনুভব করেন, সবিতাদেবীর কবি-মন সেসবই রূপান্তরিত করেছে কবিতায়। কিন্তু এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে, তাঁর কবিতাগুলি অতি সাধারণ। এখানেই সবিতাদেবী আমাকে বেশ অবাক করেছেন। তিনি প্রথাগত অথবা মুক্তছন্দে লিখেছেন কবিতাগুলি। দু’ধরনের ছন্দেই সুন্দর দখল লক্ষ করে প্রীত হলাম। পড়তে গিয়ে যে কোনও পাঠক টের পাবেন যে, কবি হিসেবে সবিতাদেবীর উপলব্ধি গভীর এবং সেই কারণেই স্বচ্ছ। বানিয়ে কিছুই লেখেননি তিনি। বলার ধরনেও একঘেয়েমি কানে আসবে না। আমার মতে, রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি কবিতায় মন দিতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু কবিতা রচনায় তাঁর অবশ্যই অধিকার ছিল।

‘উটের দুধ’ লিখেছেন সমর রায় চৌধুরী। তাঁর সাত নম্বর কবিতার বই। কবির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। বাইরে তিনি মিতবাক, সজ্জন। আসলে আপাদমস্তক বিদ্রোহী সত্তা। বইটার নাম থেকে সেই বিদ্রোহের আঁচ পেয়েছিলাম। তবে এমন ভাবার কারণ নেই যে, তাঁর কবিতার সুর চড়া। বরং বেশ নরম। কখনও রোমান্টিক বলে ভুল হতে পারে। মনে হতে পারে যে, কবি ছেলেমানুষের মতো দুষ্টুমি করছেন। তিনি ময়ূরের চারা পুঁততে পারেন আর পদ্ম ফুল পুষতে পারেন। আলনায় মেজ বউকে এবং শোকেসে ছোট বউকে ভাঁজ করে রাখার ঘটনায় তিনি অনায়াসে দেখে ফেলেন। ‘নো পয়েজি’ রান্নার রেসিপি দিতে পারেন কবিতাচ্ছলে। ‘স্কিজোফ্রেনিয়া’ কবিতার প্রথম লাইন— ‘একটা আলমারির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকি’। সাংঘাতিক!

দর্শনে একটা বস্তুর গুণকে আরেকটা বস্তুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে। এটাকে কী বলে তা এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু সমর রায় চৌধুরীর কাছে গুণের বস্তু বদল খুব প্রিয় বিষয়। বইয়ের নামকরণে তিনি পাখির উপর স্তন্যপায়ীর গুণ আরোপ করেছেন। এই গুণ বদল তাঁর প্রতিবাদের হাতিয়ার, যেটা মিছিল-মিটিং-এর মতো স্থূল নয়। ‘স্বাধীনতা দিবসের বাজার ফর্দ’ কবিতাটি গুণ বদলের চমৎকার উদাহরণ। তিনি ভারী নির্বিকারভাবে ভাবতে পারেন যে, সকালে ঘুম ভাঙার পর নাককে না পেয়ে গন্ধেরা তাঁকে খুঁজতে বার হল। আরেকটি কবিতা ‘দ্বিধা’। ‘দু’দিক দিয়েই যাওয়া যায়, আমি কোন দিক দিয়ে যাব— উভয় সঙ্কটে।’

সমর রায় চৌধুরীর কবিতা অন্যরকম। স্পষ্টতার মুখোশে ঢাকা এক রহস্য। গলা নামিয়ে তোলা অব্যর্থ স্লোগান। ‘মালিক পারে না। মালিকের হয়ে আমি সঙ্গম করি।’

নৃপেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় একটি জরুরি বই প্রকাশিত হয়েছে। কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জীবনস্মৃতি, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। কোচবিহার রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্মচারী নবকান্ত চক্রবর্তীর ভাগনে দীনদয়াল চৌধুরী ছিলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণের বাল্য সহচর।আমৃত্যু নৃপেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। রাজা মারা যান ১৯১১ সালে। এর চার বছর পর দীনদয়াল চৌধুরী জীবনস্মৃতিটি প্রকাশ করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণকে অতি কাছ থেকে দেখছিলেন দীনদয়াল। রাজা যখন পাটনায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন, তখন লেখক তাঁর সঙ্গী হন। এমন একজন ব্যক্তির লেখা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জীবনী অবশ্যই মূল্যবান গ্রন্থ। তবে বইটি দুষ্প্রাপ্য ছিল বহুদিন। পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে সম্পাদক একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার রাজবংশের অতি বিখ্যাত নাম। রাজকীয় অভিমান উড়িয়ে দিয়ে তিনি কোচবিহারবাসীর অন্তরের রাজা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রাসাদের বাইরে বেরুলে ভৃত্যেরা তাঁর সিংহাসনে বসে তাঁর গড়গড়াতে তাঁর জন্য আনা উৎকৃষ্ট তামাক টানত। রাজা সেটা জানার পরেও শাস্তির কথা ভাবতেন না। ইংরেজদের পক্ষ থেকেও তাঁকে সিংহাসনে রাখার জন্য অকাতরে সমর্থন আসত। দীনদয়াল বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, শৈশব থেকেই নৃপেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে কীভাবে রাজোচিত গুণাবলির বিকাশ ঘটেছিল। কোচবিহারের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কারকে জয় করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশ গিয়েছিলেন।

ইউরোপের অনেকগুলি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। একবার সপরিবারও যান। সেবার দীনদয়াল উদ্‌বেগ জানিয়ে বলেছিলেন যে, ভগবান না করুন, সমুদ্রযাত্রায় কোনও অঘটন ঘটে গেলে কোচবিহার অনাথ হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মসমাজখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়েছিল। দীনদয়াল জানিয়েছেন, কেশববাবুরা দলবল নিয়ে হলদিবাড়ি স্টেশনে নেমে গোরুর গাড়ি আর পালকি চেপে বেশ কসরত করে কোচবিহারে এসেছিলেন। বস্তুত, দীনদয়াল রচিত এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটিতে এমন অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাবে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ থেকে শুরু করেছেন তিনি। রাজা হওয়ার জন্য নৃপেন্দ্রনারায়ণের পথ আদৌ সুগম ছিল না।

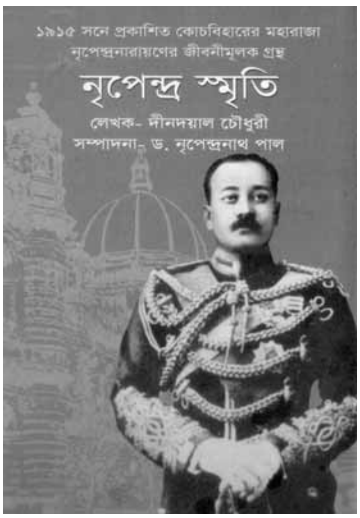

কীভাবে অন্তঃপুরকে সামলে শিশু নৃপেন্দ্রনারায়ণের অভিষেক হয়েছিল, তার চমৎকার বিবরণ আছে। বারাণসী এবং পাটনায় রাজার ছাত্রজীবনের বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন তিনি। শুনিয়েছেন রাজার নানা সময়ের নানান গল্প। বইটিতে লেখককে লেখা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিভিন্ন বয়সের চিঠিগুলিসহ বেশ কিছু মূল্যবান ফোটো স্থান পেয়েছে। কোচবিহার নিয়ে আগ্রহী পাঠকের কাছে বইটি অবশ্যপাঠ্য। দীনদয়ালের রচনাভঙ্গিও বেশ সাবলীল। তবে বইটির প্রকাশনা আরও সুন্দর হতে পারত।

নিজস্ব যাপন। সবিতা রায়। পরম্পরা। কলকাতা-৯। ১০০ টাকা। **উটপাখির দুধ**। সমর রায় চৌধুরী। পাঠক। কলকাতা-৯। ৮০ টাকা। **নৃপেন্দ্র স্মৃতি**। দীনদয়াল চৌধুরী। সম্পাদনা- নৃপেন্দ্রনাথ পাল। অণিমা প্রকাশনী। কলকাতা-৯। ৮০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভাবনা বাগান

আটলান্টায় বসে ডুয়ার্সকে অনুভব করেছি কেবল

সবুজ ডুয়ার্স থেকে ১৪,০০০ কিলোমিটার দূরে উত্তর আটলান্টা শহরের অন্তর্গত কেনেস (Kenesaw) শহর ঘুরে এলাম। ঠিক বর্ষার সময় এখান থেকে রওনা হয়েছিলাম। মেঘের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে অনেক প্রতীক্ষার পর পৃথিবীর আরেক গোলার্ধে গিয়ে দুই সবুজের পার্থক্য অনুভব করার চেষ্টা করেছি বারবার। জানার ইচ্ছে অনেক। ওখানকার প্রকৃতি, মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি প্রতি মুহূর্তে বোঝবার চেষ্টা করেছি। ছেলে কর্মসূত্রে জর্জিয়া রাজ্যের কেনেস শহরে বসবাস করে। এই নিয়ে আমার দু'বার আমেরিকায় ভ্রমণ হল। ছোট থেকে কখনও ডুয়ার্সের বাইরে খুব বেশি যাওয়া হয়নি। একটু বড় হতেই বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ঘোরার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মনের আয়নায় সবুজ ডুয়ার্সকে সবসময় বসিয়ে রাখতাম। তারপর আরও বড় হতেই উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ঘুরে এলেও ডুয়ার্স আমার মনের গভীরে ছিল।

ডুয়ার্সে সারাজীবন কাটিয়ে আমেরিকায় গিয়েও নিজের দেশকে প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করেছি। ১৪,০০০ কিলোমিটার দূরে বসে সবুজ ডুয়ার্সকে অনুভব করা— এ এক অন্য অভিজ্ঞতা। আমি ছিলাম আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কেনেস শহরে। সুন্দর সাজানো শহর ছবির মতো। রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে শহরের দিকে, অল্প দূরেই ছিল কেনেস মাউন্টেন। টিলার মতো ছোট্ট পাহাড়, ঠিক যেন মেটেলি পাহাড়ের মতো। মেটেলি পাহাড়ের উপর থেকে নিচে সবুজ চালসা, লাটাগুড়িকে যেন মনে হয় সবুজ একটা দ্বীপ, ঠিক তেমনি লেগেছিল পাহাড়ের কোলে কেনেস শহরকেও। সবুজ গাছে গাছে ভরা শহরের মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ি। ওখানকার মানুষরা কিন্তু ইট-কাঠ-কংক্রিটের জঙ্গলে ভরিয়ে দেয়নি। নিজের দেশকে কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে রাখতে হয়— এটা সত্যিই শেখার মতো। আমেরিকার বাহান্নটি রাজ্যের মধ্যে মাত্র চারটি রাজ্যে ঘোরার সুযোগ হয়েছে— ফ্লোরিডা, টেনেসি, বার্মিংহাম, জর্জিয়া। চারটি রাজ্য ঘুরে বুঝলাম, পরিচ্ছন্নতাবোধে এরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

রাস্তাঘাট মসৃণ ও সুন্দর। বর্ষার আমেরিকাকে অনুভব করতে করতে এটা বুঝতে পেরেছিলাম, ডুয়ার্সে অনেক বেশি বৃষ্টি হওয়াতে ডুয়ার্সের মানুষকে অনেক বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবুও সবুজ ডুয়ার্স যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কতটা ভরপুর, প্রতি মুহূর্তেই তা অনুভব করেছি। শুধু যদি একটু সচেতন হতে পারতাম। ওখানে অক্টোবর মাস থেকে গাছের পাতার রং পরিবর্তন হতে শুরু করে। সবুজ থেকে লাল-হলুদ বিভিন্ন রঙে পরিবর্তিত হয় গাছের পাতা, যাকে বলা হয় fall color। ওই সময়ে পর্যটকরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ অনুভব করতে। এর পরেই পাতা ঝরে যায়। চলে আসে রুক্ষ শীত। অদ্ভুত বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা বিরাজ করে চারদিকে। এইভাবে ওখানকার ঋতুপরিবর্তনও দেখার সুযোগ হয়েছে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, নির্জনতা— সব কিছু আমাকে আকৃষ্ট করলেও আমার ডুয়ার্সকে অনেক বেশি সবুজ, সজীব ও অপরূপ মনে হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী, ভাষা, বিচিত্র ভূমিখণ্ড, নানান জলবায়ুর সমাবেশ— সব মিলিয়ে ছোট্ট একটি ভারত যেন। শুধু আমরা, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা যদি পরস্পরের হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাই তাহলে আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারব আমাদের গর্বের ডুয়ার্সকে।

মীনাক্ষী ঘোষ

ঋত্বিক নাট্য উৎসব ২০১৬

গত ২৮ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০১৬ ঋত্বিক নাট্যসংস্থার আয়োজনে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পাঁচ দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য নাট্য উৎসব। সংস্কৃতিমন্ত্রক, ভারত সরকারের সহায়তায় জমজমাট এই পাঁচ দিনের এই নাট্য উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশের ঢাকা থেকে আগত মোট ৭টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। উৎসবের উদ্‌বোধন করেন শহরেরই প্রবীণ নাট্যকর্মী ও শিক্ষাবিদ অঘোর ভট্টাচার্য। ঋত্বিক-এর কর্ণধার ও প্রাণপুরুষ প্রয়াত মলয় ঘোষের স্মরণে 'মলয় নাট্য সম্পাদনা' প্রদান করা হয় শিলিগুড়ির প্রবীণ নাট্যকর্মী ও মঞ্চ অভিনেতা জগদীশ করকে। উৎসবের উদ্‌বোধনী সন্ধ্যায় দু'টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথমে শান্তিপুর রঙ্গপীঠ মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে 'জীবন মৃত্যু' ও দ্বিতীয় নাটক পরিবেশিত হয় বর্ধমানের 'এবং আমরা' নাট্যদল দ্বারা নাটক, মহাভারতের পাতা থেকে 'অন্ধ যুগ'। উৎসবে মঞ্চস্থ মোট আটটি নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর 'শুক' (নাটক/নির্দেশনা— তমোজিৎ রায়), আয়োজক সংস্থা ঋত্বিক-এর বহু প্রশংসিত

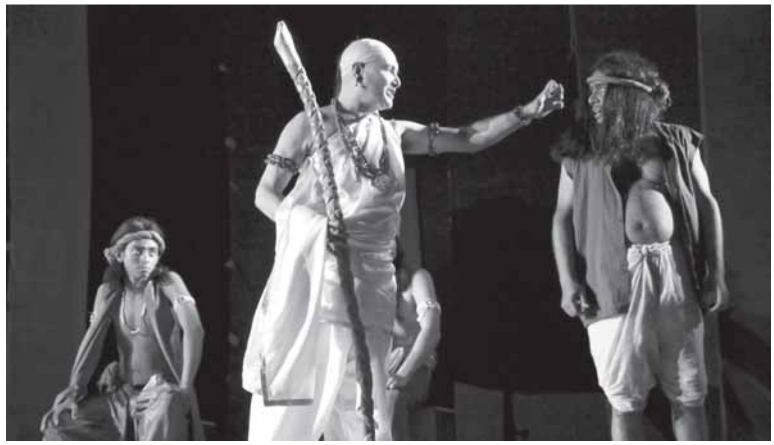

নাটক 'মাসান— দ্য কর্ক ডল' (নাটক/নির্দেশনা— সাধন চক্রবর্তী)। বাকি নাটকগুলির মধ্যে কলকাতা মৃচ্ছকটিক প্রযোজনা 'কৃষ্ণা' (নাটক/নির্দেশনা— শুভাশিস ব্যানার্জি), বালুরঘাট নাট্যকর্মীর 'দ্রোহ' ও ঢাকা বাংলাদেশের নাট্যম রেপার্টরি প্রযোজনা মাদার পিরের উপাখ্যান অবলম্বনে 'দমের মাদার' (নাটক— সাধনা আহমেদ, নির্দেশনায় আইরিন পারভিন লোপা) দর্শকদের মনে সাড়া জাগিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নাট্য মানচিত্রে ৩২ বছরের ঋত্বিক নাট্যসংস্থা একটি উজ্জ্বল নাম, যারা ধারাবাহিকভাব দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নিজস্ব নাট্য প্রযোজনা ছাড়া বিভিন্ন নাট্য উৎসবের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশের নাট্যদলগুলির ভিন্নধর্মী নাট্য প্রযোজনার স্বাদ শিলিগুড়ি নাট্যমনস্ক মানুষদের মধ্যে উপহার দিয়ে আসছেন অনলস। তবে এবারের উৎসবে তুলনামূলকভাবে দর্শকসংখ্যা কম হওয়ায় আশাহত হয়েছেন উৎসব কর্তৃপক্ষ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ইতিকথায় পশ্চিম ডুয়ার্স ও মালবাজারে বইটির শুভ উদ্‌বোধন

এই সবুজ ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র মাল শহর। সেই মালবাজারের ভূমিপুত্র না হয়েও শুধু মাল শহরকে ভালবেসে মালবাজারের নানা তথ্য, ইতিহাস নিয়ে 'ইতিকথায় পশ্চিম ডুয়ার্স ও মালবাজার' শীর্ষক বইটি লিখেছেন মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক স্বপনকুমার ভৌমিক। গত ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার এক সন্ধ্যাকালীন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে বইটি প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের প্রাক্তন শিক্ষক অরূপবরণ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, সাহিত্যিক তথা গবেষক রাম অবতার শর্মা প্রমুখ। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলেন, 'বর্তমান প্রজন্মের বই পড়ার প্রবণতা কম, কিন্তু চক্রাকারে একদিন এমন সময় ঘুরে আসবে, যখন মানুষ আবার সেই বইকেই পরম বন্ধু মনে করবে। বই মানুষকে সমৃদ্ধ করে।'

মাল শহরের বিবর্তন নিয়ে এই প্রথম বই লেখা হল। 'মাল' নামকরণের উৎস, এলাকা, ভূপ্রকৃতি, নদনদী, আদি পর্যায়ে ডুয়ার্স, যোগাযোগ, পরিবহণব্যবস্থা, দেশভাগ ও শরণার্থীদের আগমন, শৈশবের মালবাজার, সরকারি উদ্যোগে মালবাজার শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, মালবাজারে চিনা বসতি, মালবাজার ইউরোপিয়ান ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মালবাজারের মহতী ব্যক্তিদের আগমন, বিনোদন, মালবাজারের কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব— এইসব নিয়ে বিশদভাবে এই বইটিতে লেখা হয়েছে, যা আগামী প্রজন্ম, গবেষক, আগ্রহী মানুষকে সমৃদ্ধ করবে। স্বপনবাবু জানান, তিনি ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করবার চেষ্টা করেছেন। পরে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে ২০০৫ সালের ১ জুলাই থেকে তাঁর মালবাজারে থাকা। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মালবাজার থাকবার ফলে তাঁর সুযোগ হয়েছে এ অঞ্চলের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রায় সকল শ্রেণির সান্নিধ্যলাভ। ভালবেসে ফেলেছেন এখানকার জল-হাওয়া-মাটি ও অরণ্যানিকে। পশ্চিম ডুয়ার্সের পশ্চিমাংশের এক বিস্তৃত এলাকার একমাত্র কলেজ পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে সুযোগ ঘটেছিল অসংখ্য জনজাতি থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সান্নিধ্যলাভ। অজানাকে জানবার আনন্দে এবং তথ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন পশ্চিম ডুয়ার্সের দুরূহ কোণগুলিতে। মালবাজার ও ডুয়ার্স যথার্থই ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। অসংখ্য জনজাতির মিলনক্ষেত্র হল এই ডুয়ার্স। ১৫১টি নৃগোষ্ঠীর এত সুন্দর

সহাবস্থান ভারত তো বটেই, পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে বলে তিনি মনে করেন। তাই সময়ের পথে চলতে গিয়ে মালবাজারকে গভীরভাবে ভালবেসে তাঁর এই ভালবাসার এক ক্ষুদ্র প্রকাশ এ গ্রন্থখানি। আমরা ডুয়ার্সবাসীরা আশা করি, ডুয়ার্সের মানুষজন ও বহিরাগত পর্যটকদেরও এই বইটি ভাল লাগবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস'-এ জলপাইগুড়ি ক্লাব রোডের 'প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র'র শিশুরা মনের আনন্দে মেতে উঠেছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানটি পালিত হত। কিন্তু ১৯৯২ সালের পর প্রতি বছর ডিসেম্বরের তিন তারিখে এইসব প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের মা— এরা বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই তা পালন করে চলেছে। এ বছরও তার অন্যথা হয়নি। অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলায় ছোট্ট ছোট্ট এই ছেলেমেয়ে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হয়ে গিয়েছিল স্কুলের মাঠে, তাদের মায়েদের সঙ্গে। বাচ্চাদের নাম নথিভুক্তিকরণ কর্মসূচির পর বাচ্চাদের নিয়ে একটি 'র‍্যালি' ডিএম অফিসে যায়। সেখানে ডিএম-এর কাছে কিছু দাবি তুলে ধরা হয়। সেসব দাবির মধ্যে ছিল এইসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চাদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। যেমন বাসে বিনা পয়সায় যাতায়াত বা চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ। র‍্যালির শেষে ছোট্ট এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আটজন প্রতিবন্ধী শিশু ও দু'জন মায়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এই আট শিশু ও দু'জন মা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। 'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্যই এই পুরস্কারজ্ঞাপন।' জানালেন শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষা স্বাতী মিত্র মজুমদার। এ বছর বাইরের বিশেষ কেউ না এলেও এই ছোট ছোট সবুজ, অবুঝ ছাত্রছাত্রীর উৎসাহ ছিল চোখে দেখার মতো। অনুষ্ঠানের মাঝে খাওয়াদাওয়ার পর্বও ছিল, আর ছিল এই কচিকাঁচাদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচে-গানে সমস্ত অনুষ্ঠানটি মাতিয়ে রেখেছিল ওরাই। কে বলবে তখন ওরা 'প্রতিবন্ধী'? ওদের চোখে শুধু প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার স্বপ্ন। ওরাই তো আসল জয়ী।

শাঁওলি দে

সরকারি কর্মচারীদের রক্তদান শিবির

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের ডিএম ইউনিটের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল সদর এসডিও অফিস সংলগ্ন পুল গ্যারেজে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিক। ছিলেন কিছু উজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন এডিএম জেনারেল এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিএমওএইচ। মোট ১৬৩ জন রক্তদাতার মধ্যে ছিলেন আধিকারিকরাও; মানিক সরকার (সুপারিনটেন্ডেন্ট অব এক্সাইজ), পার্থ দে (আরটিও), মেঘা লামা (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), ইউটন শেরা (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), শুভজিৎ রায় (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট), পারমিতা রায় (ডিপিআরডিও)। রক্তদান করতে আসা সাধারণ মানুষের এত সুন্দর সেবামূলক মনোভাব দেখে স্পষ্টই মনে হয়েছে, সামাজিক কল্যাণের কথা ভাববার মতো মন এখনও মরে যায়নি, বরং তাঁরা এ ধরনের ডাকে সাড়া দিতেই ভালবাসেন। সর্বোপরি, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন ফেডারেশনের সেক্রেটারি পুলক কর।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের দ্বিতীয় আড্ডা জমজমাট

'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব'-এর মজার আসরে গত ১৭ ডিসেম্বর হইহই করে কাটল কয়েকটা ঘণ্টা। এবারে ছিল একটি খেলা। দশজনকে আলাদা আলাদা কাগজে তাদের মনের কোনও বিষয় লিখে জমা দিতে বলা হল। প্রত্যেকে সেরকম এক-একটি বিষয় লিখে জমা দিলেন উদ্যোক্তার কাছে। এবার সেগুলো ঝাঁকিয়ে মিলিয়ে-মিশিয়ে রেখে দেওয়া হল টেবিলের মাঝখানে। এক-একজন তার এক-একটা তুলবে, এবং সেই বিষয় নিয়ে কিছু বলবে— তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। একজনের দেওয়া বিষয়ে আর-একজন বলবে। এবারে ওই দশজনকেই আবার সাদা কাগজ দেওয়া হল নম্বর দেওয়ার জন্যে। প্রত্যেকে যখন বলবে, অন্যেরা তাতে নম্বর দেবে। সবশেষে সকলের নম্বর যোগ করে দেখা গেল, প্রথমে হয়েছে ঋতুপর্ণা।

বিষয় আর মূল বক্তব্যগুলি কেমন ছিল—

রমি (নাহা), 'শান্তিনিকেতন'— শান্তিনিকেতনের সব ভাল দিক উল্লেখ করে একটি দুঃখের কথা জানাল রুমি। উন্নয়নের কাজ যা চোখে পড়ে তা মোটেই আশানুরূপ নয়। সাধারণ মানুষের কষ্ট দেখেও কষ্ট হয় বলে দুঃখ প্রকাশ করল।

সীমা (সান্যাল চৌধুরী), 'আমার মেয়েবেলা'— রক্ষণশীলতায় মোড়া যে পরিবারে সীমার মেয়েবেলা কেটেছে, সেখানে শুধু একটা ঘরের ছবিই ওর সারা মেয়েবেলার স্মৃতি ঘিরে আছে। সেই ঘরটি সীমার পড়ার ঘর, সেই ঘরই ওর গানের ঘর। রুটিনমাফিক গান আর পড়া ছাড়া মেয়েবেলার কোনও গল্প নেই। বাবা-মায়ের মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে খুব প্রিয় দাদার স্মৃতিও।

ছন্দা (রায়), 'এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা'— আমেরিকায় যখন শেষবার ছেলের কাছে গিয়েছিল, তখন নাতনিরা ছিল মাত্র ছ'মাসের। তারা আসছে দেড় বছর বাদে। অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম। কিন্তু বাদ সাধল হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিপর্যয়। অ্যাক্সিডেন্টে স্বামীর বুকের সাতটা পাঁজর ভেঙে গেল। ছেলে, বউ, নাতনি সকলেই এল, কিন্তু বেড়ানো হল না। দ্বিতীয়ত, নোট বাতিল। ছন্দার মতে এটা

ঠিক হল না। কেউ মারা গেলেও আগে লাইনে দাঁড়িয়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছে— এরকম একটা পরিস্থিতির শিকার হতে হল সাধারণ মানুষকে, যা কখনওই কাম্য নয়।

শিল্পী (মুখার্জি), 'আড্ডা ও আড্ডাঘর'— প্রধানত উঠে এল আড্ডার কথাই। আড্ডা মানুষকে একে অপরের কত কাছে এনে দেয়, তারই কথা। সেই কথা মাথায় রেখে জলপাইগুড়ির এই আড্ডাঘর সত্যিই একটি দুর্দান্ত কনসেপ্ট। উত্তরোত্তর আড্ডাঘরের শ্রীবৃদ্ধি হোক— এই কামনা করল শিল্পী।

মনোমিতা (পাল), 'রবীন্দ্রনাথ'— আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রবীন্দ্রনাথ কতটা প্রভাব বিস্তার করে আছেন। এমনকি প্রথম পাঠের হাতেখড়িও যে তিনিই, সেটাই ছিল মনোমিতার বক্তব্যের বিষয়।

রীনা (ভারতী), 'প্রাক্তন'— খুব সুন্দর বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবেই উপস্থাপন করল রীনা। বলল, 'প্রাক্তন আমার কাছে যতটা প্রাক্তন, তার চাইতে অনেক বেশি বর্তমান।'

কঙ্কণা (নন্দী), 'জলের অপচয়'— এ ধরনের বিষয় শ্রীমতী ডুয়ার্সের আলোচনায় উঠে আসায় সকলেই খুশি। কারণ, আমরা নিজেরাও যাতে সচেতন হই এবং অন্যদেরও যাতে সচেতন করতে পারি, তারই প্রচেষ্টার শুরু। সকলেই কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করল এই আলোচনায়। কঙ্কণা তার বক্তব্যে জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে যেমন বলল, তেমনি তুলে ধরল আমাদের অপচয়ের নানান ধরনধারণ ও তার প্রতিকারের উপায়ও।

সুদেষ্ণা (নিয়োগী), 'পিঠে-পুলি'— সত্যিই জিবে জল আসার মতো খাবার। কিন্তু ধীরে ধীরে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। ঘরে ঘরে আর আজকাল হয় না এসব। আমরা শ্রীমতীরা কি এই শীতে পিঠে-পুলি খাওয়ার একটা আয়োজন করতে পারি না? প্রশ্ন তুলল সুদেষ্ণা। এর উত্তরেও আলোচনার ঝড় উঠল।

ইতি (কর), 'রবীন্দ্রসংগীত'— যে কোনও অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীতের একটি অন্যরকম অবদান আছে, সেটাই ছিল তার বক্তব্যের মূল কথা।

ঋতুপর্ণা (দত্ত), 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'— ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে বলতে গিয়ে বলল, 'প্রথমেই সমস্ত শ্রীমতীকে আমার শ্রীযুক্ত প্রণাম।' তারপর তার বক্তব্যে উঠে এল বরেণ্য নারীদের উদাহরণ, যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাঁদের জীবনের পথে নিজেদের চরণচিহ্ন আঁকতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের মতামতে নারী-পুরুষে ভেদাভেদের কথা ছিল না, ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

আড্ডা জমে উঠেছিল দারুণ। পরের 'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব'-এর বসার দিন ঠিক হল ৭ জানুয়ারি ২০১৭। এই শীতের মরশুমে একটা পিকনিক না হলে জমছে না, এমন কিছু একটা ভাবা যায় কি না, সে বিষয়েও আলাপ হবে সে দিন। সেই সঙ্গে আলোচনা হবে পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে। যাঁরা আমাদের 'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব'-এর সদস্য হতে চান, তাঁরা যোগাযোগ করুন মুক্তা ভবনের দোতলায় আমাদের 'এখন ডুয়ার্স'-এর দপ্তরে। আমরা শ্রীমতীরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারি কিন্তু। আড্ডা-গল্প ছাড়াও অনেক ভাল কাজও। আসুন, সবাই হাতে হাত মেলাই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ফ্যাশন কুইন ডুয়ার্সকন্যা কৃতী

ডুয়ার্সের মেয়ে এবার ফ্যাশন কুইন ডুয়ার্সের কন্যারা কী না পারে। সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা খেলাধুলোর পরিসর ছাড়িয়ে এবার ফ্যাশন কুইন কনটেস্টেও ডুয়ার্সের বীরপাড়ার মেয়ে কৃতী শর্মা। 'মিস ইন্ডিয়া এক্সকুইজিট' প্রতিযোগিতায় এ বছর সে পেল সেকেন্ড রানার-আপ 'নেশন পেজ্যান্ট'-এর শিরোপা। রজনী সুব্বা পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় সকলের যেদিকে লক্ষ ছিল, কৃতীরও সেদিকেই। বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজয়ীরা এবারে মিলিত হবেন আমেরিকায়। সেখানে হবে বিশ্ব প্রতিযোগিতা। ফলে বড় প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা থাকাটাই স্বাভাবিক। কৃতীরও সেটাই ছিল। কিন্তু কৃতীর সঙ্গে কথা বলে এটুকু বোঝা গেল যে, সেকেন্ড রানার-আপ হয়ে একটুখানি মন খারাপ হলেও পরের বারের জন্য নিজেকে তৈরি করাটাই এখন ওঁর মূল লক্ষ্য। স্পষ্ট হিন্দি এবং ইংরেজিতে কথা বলার সময় ওঁর আত্মবিশ্বাস বারবার ধরা পড়ছিল ওঁর কণ্ঠস্বরে।

কুড়ি বছরের মেয়ে কৃতী ছোটবেলা থেকেই সব ব্যাপারে খুব উৎসাহী। বিন্নাগুড়ির সেন্ট জেমস স্কুলে পড়ার সময় স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনেক প্রাইজ সংগ্রহ করেছে। শুধু তা-ই নয়, মেধা, মনোযোগ ও নিষ্ঠা থাকার কারণে পড়াশোনাতে বরাবরই ভাল রেজাল্টও করে এসেছে। বীরপাড়া স্কুলের পর শিলিগুড়ির ডন বস্কো স্কুলে পড়বার সময় সেখানে একটি ফ্যাশন কনটেস্টে প্রাইজ পায় প্রথম। যদিও তখন এসব নিয়ে ভাবনা শুরু হয়নি, তবুও খুব উৎসাহ বেড়ে গেল। এখন পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে কলকাতায় পড়ছেন কৃতী। কিন্তু ভিতরের খিদের জ্বালা ওঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে বহু দূর। তীব্র

আকাঙ্ক্ষায় ছুটে গিয়েছেন পুনেতে। গ্রুমিং শুরু সেখানেই। রিতিকা রামত্রি ম্যাডামের কাছে ক্লাস করছেন অত্যন্ত একনিষ্ঠভাবে। রজনী সুব্বা পরিচালিত ‘মিস ইন্ডিয়া এক্সকুইজিট’ ফ্যাশন কুইন কনটেস্টে অনেক প্রচেষ্টা ও প্রতীক্ষার পর এ বছর সেকেন্ড রানার-আপ হয়েছেন কৃতী। মাথায় ক্রাউন উঠেছে ‘Nation Pageant’ Second Runner-up-এর। ডুয়ার্সের বীরপাড়ার মেয়ে কৃতী দেখিয়ে দিলেন, ভৌগোলিক অবস্থান কোনও প্রতিবন্ধকতাই নয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সঠিক জায়গায় পৌঁছে ঠিক নিজেকে মেলে ধরেছে, যা বুঝিয়ে দিয়েছে, হীরে নিজের জ্যোতিতেই আকৃষ্ট করে জহুরির দৃষ্টি। এখানে পৌঁছানোর আগে কলকাতাতেও বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে ও। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে মডেল হিসেবে কাজ করেছেন কৃতী। কিন্তু সেখানে ঠিক মনের খোরাক

পাননি। কৃতীর বক্তব্য অনুযায়ী, ‘ফ্যাশন শো-গুলোতে কিংবা মডেল হিসেবে বিজ্ঞাপনের কাজ করলে হয়ত টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু আমার অনেক বেশি স্যাটিসফ্যাকশন বিউটি কুইন প্রতিযোগিতায়। এইসব প্রতিযোগিতাতে সবসময়েই চেহারার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টেলিজেন্সির টেস্টও নেওয়া হয়। পুরোটা পেরতে পারলে তবেই শিরোপার সম্মান। এতগুলো হার্ডল টপকে ক্রাউন ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা বলেই ওটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ মনে হয়।’ সম্প্রতি এরকমই আরও একটি কনটেস্টে ‘Top Model’ First Runner-up হন কৃতী শর্মা। আগামী বছর যাতে ভারতের বিজয়ী হিসেবে কৃতী দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তারই প্রস্তুতি চলবে গোটা বছর ধরে। আমরাও ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে ওঁর সাফল্য কামনা করি।

শ্বেতা সরখেল

পাঠকের দাবিতে আবার শুরু হল জনপ্রিয় কলম ‘ডুয়ার্সের ডিশ’। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনীরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে।

রাই শাকে আড় মাছ

উপকরণ— আড় মাছ ৫/৬ টুকরো, কালো সরষে ৪/৫টি, কাঁচালংকা-নুন বাটা ৫/৬ চা চামচ, পেঁয়াজ ১টা কুচানো, টম্যাটো ১টা (বিচি ফেলে সরু লম্বা করে কাটা), কাঁচালংকা ৫/৬টা, রাই শাকের বড় পাতা (যতগুলো মাছ, তত পাতা), সরষের তেল পরিমাণমতো, নুন আন্দাজমতো।

প্রণালী— রাই শাকের পাতাগুলোর মাঝখানের শক্ত ডাঁটা কেটে ফেলে পাতায় হালকা নুন মাখিয়ে রাখতে হবে। অন্য দিকে মাছের টুকরোগুলোতে লংকা, নুন দিয়ে সরষে বাটা ও সরষের তেল দিয়ে মেখে আধ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। পরে পাতাগুলোতে হালকা চাপ দিয়ে জলটা ঝরিয়ে নিতে হবে, ও পাতাগুলো আলাদা করে ছড়িয়ে রাখতে হবে। প্রত্যেকটা পাতার মাঝখানে একটা করে ম্যারিনেট করা সরষে বাটাসুদ্ধ মাছ, পেঁয়াজ কুচি, টম্যাটো কাটা ও চেরা কাঁচালংকা দিয়ে মাছটাকে পাতা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। ফ্রাই প্যানে অল্প সরষের তেল দিয়ে হালকা ব্রাশ করে নিয়ে, মাছগুলোকে পরপর ফ্রাই প্যানে বিছিয়ে দিয়ে, গ্যাসের আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। একটু পরপর এ পিঠ-ও পিঠ উলটে দিতে হবে, যতক্ষণ না পাতার মধ্যে হালকা পোড়া ভাব না আসে। ফ্রাই প্যানের জলটা শুকিয়ে গেলেই মাছ তৈরি। গরম সাদা ভাতে খাবেন। রাই শাক, সরষে, কাঁচালংকা আর মাছের মিলমিশে অপূর্ব স্বাদ ও গন্ধ অবশ্যই আপনাকে পাহাড় ও ডুয়ার্সের কথা মনে করিয়ে দেবে।

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-10 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টলে থাকছে যে সব বই

কোচবিহার বইমেলা (৩-১০ জানুয়ারি) আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স উৎসব (৭-১৬ জানুয়ারি)

পর্যটনের বই

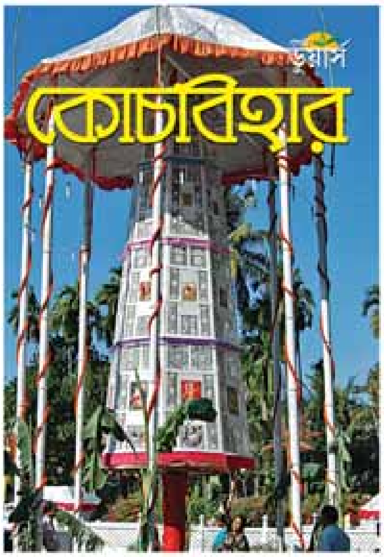

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

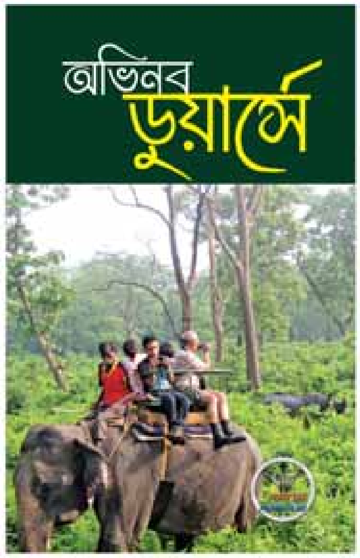

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

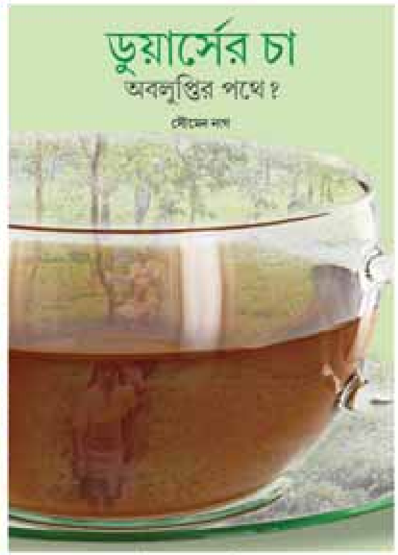

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

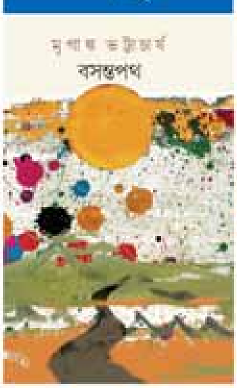

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

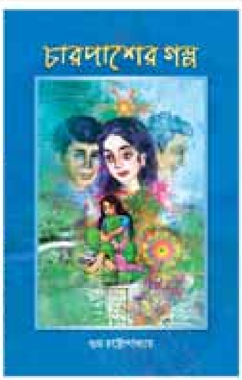

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.